পুষ্পাঞ্জলি।

শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

সোনামুখী—বাঁকুড়া।
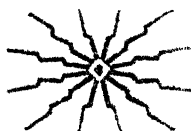
হাওড়া।
বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

১৩১৫।

উৎসর্গ পত্র।

—:০:—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

বাবা! আপনার শ্রীচরণ যুগলের শীতল ছায়ায় থাকিয়া বহু প্রবন্ধ বিবিধ সাময়িক পত্রে লিখিয়া ভক্তি সাহিত্যের সেবা জনিত পরমানন্দ ভোগ করিয়াছি এবং আত্ম শোধনের প্রয়াস পাইয়াছি; তাহার কয়েকটির সমষ্টিই এই "পুষ্পাঞ্জলি"। "কানন" লিখিয়া মা'কে উপহার দিয়াছিলাম। আপনি অকৃতী সন্তানের ভক্তি উপহার "পুষ্পাঞ্জলি" গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন। দীন, দুঃখী, অন্ধ আতুরের দুঃখে আপনার প্রাণ ব্যথিত হয়; তজ্জন্য গরীবের সেবা কল্পে পুষ্পাঞ্জলির আয় উৎসর্গীকৃত হইল।

আপনার স্নেহের—রসিক।

———

সূচীপত্র।

—:০:—

পুষ্পাঞ্জলি।

অনুরাগ-পুষ্পাঞ্জলি।

দীন হীন মোর সম না আছে সংসারে।
পাপে বিমলিন, ভাসি অকূল পাথারে॥

দুঃখে হিয়া জর জর, উদ্বেগ পুরিত।
মহা দুশ্চিন্তার ভারে পরাণ পীড়িত॥

দিন দিন আয়ুক্ষীণ শমনের ভয়—
আকুল করিছে সদা এমোর হৃদয়॥

চিনিতে না পারি আমি ভবের কাণ্ডারী।
বানচাল্ হ'ল বুঝি, জীর্ণদেহ তরী॥

আজি পড়িয়াছে মনে, অনাথ শরণ।
কাতরেতে তাই ডাকিতেছি অনুক্ষণ॥

ডাকিতে ডাকিতে নাম, হেলায় শ্রদ্ধায়।
অনুরাগ-ক্ষীণছায়া লেগেছে হিয়ায়॥

ভাব নাই, প্রেম নাই, প্রীতির অভাব।
ভরসা কেবল আছে, নামের প্রভাব॥

আনিয়া পুলকে, হরি, হ'য়ে কুতুহলী।
ধর, আনিয়াছি, অনুরাগ-পুষ্পাঞ্জলি॥

ভক্তচরিত।

—:o:—

(১)

"ভক্তমালরত্নবরে অন্তর উজ্জ্বল করে,
নিত্যানন্দ—সাগরে ভাসায়।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন সকল ধনের ধন,
যদি পাবে, করহ আশ্রয়॥"

জগতে এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই। ইঁহাদের বাহিরের কোন বেশ নাই—কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নাই। ইঁহারা সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারের কার্য্য করেন—দেখিলেই বোধ হয়, যেন ঘোর সংসারাবদ্ধ, বিষয়মুগ্ধ জীব। ইঁহারা ভজন সাধন অতি গোপন ভাবে করেন, জগতের কেহ তাহা জানিতে পারে না, এমন কি প্রিয়তমা পত্নী পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ের গুপ্তভাবের রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থা হন, অথচ ভগবানের এমনি মাহাত্ম্য, এমনি কৌশল যে, সামান্য সূত্র সংযোগে তাঁহাদের মহিমা জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইতর সাধারণ তখন বুঝিতে পারে—তাঁহাদের কি তেজ, কি প্রভাব, কি মাধুর্য্য, কি গৌরব, হৃদয়নিহিত ভক্তি কুসুমের কি সৌরভ। ইহারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন, আমাদের ন্যায় সংসার করিয়া থাকেন, পার্থক্যের মধ্যে এই যে, এই সকল ভক্ত সংসারে থাকিয়া পদ্মপত্রে বারির ন্যায় নির্লিপ্ত। নারিকেলের বাহ্যাবরণ কঠিন, কিন্তু উহার অভ্যন্তর অতি উপাদেয় শস্যে ও সুস্বাদু জলে পূর্ণ। এই সকল মহৎলোকের বাহ্যভাব ঠিক তদ্রূপ। অন্তরপ্রদেশ অমৃতে অভিষিক্ত; সুকৃতি বলে আস্বাদন করিবার সুবিধা হইলে আমাদের প্রাণ শীতল হয়, হৃদয়, প্রেমের মধুরগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে—সাংসারিক মলিনতায় পূর্ণ মন কি এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। অদ্য আমরা এরূপ এক মহাপুরুষের চরিত কথা কীর্ত্তন করিব; এই ভগবৎ-নিষ্ঠ পুরুষ এক ভক্ত রাজা।

আমাদের দেশেই পূর্ব্বকালে ইনি বাস করিতেন। রাজমহিষীও পরম-বৈষ্ণবী ছিলেন, কিন্তু বাহিরে রাজার ভক্তির কোন পরিচয় না পাইয়া

রাজাকে হরিভক্তিহীন মনে করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এ দুঃখ শীঘ্রই দূরীভূত হইল। একদিন নিশাকালে নিদ্রা যাইতে যাইতে সহসা রাজা "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিলেন। রাজা যে "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না; রাণী কিন্তু তাহা শুনিতে পাইয়া ছিলেন। যে রাজাকে তিনি অভক্ত জ্ঞান করিতেন, আজ নিদ্রাবস্থায় তাঁহার মুখে অমৃতময় কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে, রাণী এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। বাদ্য-ধ্বনিতে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল, রাজা ঐ উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাণী বলিলেন, "গতকল্য রাত্রিকালে আপনার মুখে মধুর কৃষ্ণ নাম শুনিয়াছি তাহারই স্মরণ জন্য এই প্রীতিউৎসব।" রাজা কহিলেন, "সেকি? কখন ঐ প্রাণজুড়ান নাম আমার মুখ হইতে বাহির হইল?" রাণী তদুত্তরে বলিলেন "ঘুমের ঘোরে আপনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন ইহা পরম-সৌভাগ্যের কথা।"

অনন্তর ভক্তরাজা হৃদয়পুটিকায় অতি নিভৃত প্রদেশে অতি যত্নসহকারে, মনপ্রাণ রসায়ণ যে মধুর কৃষ্ণনাম রক্ষা করিতেছিলেন, হৃদয়নিহিত সেই অমূল্যরতন, অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ বাক্য মহিষীর মুখে শুনিয়া হাহাকার করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞা যেন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, রাণী এ দৃশ্য দর্শনে স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাণী মনে করিলেন, তবে কি তাঁহার কৃষ্ণভক্ত স্বামী প্রাণত্যাগ করিলেন?

"হৃদয় পুটিকা মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম।
এতদিন ইহা খুঁজি নাহি জানিলাম।"

বলিতে বলিতে তিনি শিরে করাঘাত করিয়া অতি করুণ আর্ত্তনাদে মহানুভব স্বামীর জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহার পত্নী একজন প্রকৃত হরিপরায়ণা এবং যিনি স্বয়ংই একজন কৃষ্ণগত প্রাণ নিষ্ঠাবান ভক্ত, তাঁহার জীবন কি এরূপ শোচনীয় ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে? ভগবানের কৃপাগুণে রাজার মূর্চ্ছা অপনীত হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে ভক্তের ভগবান ভক্তদম্পতির দৃঢ় অনুরাগে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন—

"সম্মুখে দেখয়ে দোঁহে নবঘনশ্যাম।
বাঞ্ছিত রতননিধি মিলে অভিরাম॥"

অবশেষে তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম ধনকে—

"প্রেমানন্দে যত্নকরি রত্ন সিংহাসনে।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে॥"

এস ভাই, এই ভক্তরাজ ও ভক্তিমতীরাণীর শ্রীচরণ-যুগলে শত কোটী প্রণিপাত করিয়া—সংসারে পাপেতাপে মলিন আমরাও ক্ষণকালের জন্য পবিত্র হইয়া অনাবিল আনন্দ ভোগ করি।

কাঙ্গালের প্রার্থনা।

—:০:—

১

হরি হে!

তুমিই কেবল, এ জগতে সার,
(আমি) দেখিলাম ভাল করে।
তুমিই কেবল, শান্তির সিন্ধু,
অশান্তির এ সংসারে॥

২

তোমাতেই শুধু, নিরমল সুখ,
(তুমি) সকল সুখের মুল।
(তুমি) প্রীতির আলয়, দয়ার নির্ঝর,
মাধুর্য্যের নাহি তুল॥

৩

তুমিই জীবের, জীবন রতন,
তোমারি করুণা গুণে।

সুখের জগৎ, রচিতা মানব,
প্রীতিহর্ষ লভে মনে ॥

৪

বিহঙ্গম সব, কাকলীর রবে,
গান করে কুতুহলে।
তরুলতা তৃণ, লভেছে জনম,
(সেত) তোমারই কৃপার বলে ॥

৫

তুমি পুরাতন, পুরুষ রতন,
(আর) পুরুষ কে বল আছে।
পুরাতন বটে, নবীন সৌন্দর্য্য,
অঙ্গে তব ভরিয়াছে ॥

৬

তোমার সৌন্দর্য্য, অক্ষয়-অব্যয়,
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার।
প্রকৃতির দেহে, যে সৌন্দর্য্য হেরি,
কেবল কণিকা তার ॥

৭

নারীর সহাস্য বদন মণ্ডল,
শিশুর সুন্দর অঙ্গ।
নীলিমা জড়িত, সুন্দশশধর,
নীলাকাশে রঙ্গ ভঙ্গ।

৮

বিশাল বারিধি, তরঙ্গে তরঙ্গে,
কি সুষমা শরকালে !

সৌন্দর্য্যের রাশি, ল'য়ে স্রোতস্বিনী
ছুটিছে, মধুর হাসে॥

৯

উদ্যানে কাননে, কুসুম রতনে,
কি সৌন্দর্য্য রহে মাখা।
অচলের শিরে, গভীর গহ্বরে,
দেখি সৌন্দর্য্যের রেখা॥

১০

অম্বরে ভূতলে, সাগর সলিলে,
যে সুন্দর ছবি হেরি!
কোন্ মূল হ'তে, এ সৌন্দর্য্য আসে,
বুঝিতে কি নাহি পারি?

১১

রবির কিরণে জলবিন্দু সনে,
ইন্দ্র ধনু যথা হয়।
তোমার কিরণ, এ বাহ্য প্রকৃতি,
তেমনি আলোক ময়॥

১২

তুমিই কেবল, সৌন্দর্য্যের মূল,
পরাণ মানস হর।
তোমারই বিম্ব, লইয়া বক্ষেতে,
প্রকৃতি এত সুন্দর॥

১৩

রবিকর বিনা, আঁধার জগৎ,
রবির আধার তুমি।

তোমা বিনা এই, বিশ্ব চরাচর,
প্রলয়ের লীলাভূমি ॥

১৪

তাই বলি তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
তুমি সত্য এই ভবে।
অপর যা কিছু, তোমারে লইয়া,
চলে যন্ত্র-যন্ত্রী-ভাবে ॥

১৫

তুমি সর্ব্বাধার, মূল নারায়ণ,
স্নেহ-আকর্ষণ-গুণে।
কুপথগামীরে, টানি লও ধীরে,
চেয়ে আছি তব পানে।

১৬

সৌন্দর্য্য মাধুরী ভরা রূপখানি,
পূজিবারে কুতুহলী,
এসেছি অধম, লহ সমাদরে,
প্রেম-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ॥

ধীরে—ধীরে—ধীরে।

—:০:—

নীরব নিথর যামিনীতে; দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় মধুর ঝঙ্কারে, এক দিন কে অশরীরীশব্দে আমার কাণে কাণে বলিয়া উঠিল, "ধীরে—ধীরে—ধীরে"। ভবিষ্যতের মঙ্গল-সঙ্কেত কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিল। তদবধি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে এবং লীলাময়ী প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, অন্তরের অভ্যন্তরে কাহার সেই মঙ্গলময়ী বাণীর অস্ফুটশব্দ শুনিতে পাই—"ধীরে—ধীরে—ধীরে।"

রজনীর তমোময় অঙ্ক হইতে নিদ্রিতা উষারাণী যখন সিন্দূর রাগ রঞ্জিতা হইয়া; নব-পরিণীতা বসন ভূষণে সুশোভিতা বালিকার ন্যায় পূর্ব্বদিকে উদিতা হইয়া অরুণ কিরণ বিভাসিত রূপের লহরী ছুটাইতে থাকে, তখন কে যেন স্মরণ করাইয়া দেয়, "ধীরে—ধীরে—ধীরে"।

পূর্ণিমা—নিশায় সুধার আকর সুধাকর যখন চারিদিকে সুধার ধারা ছড়াইতে ছড়াইতে নীলগগণে আবির্ভূত হইতে থাকে, তখন কে যেন বলিয়া দেয়, "ধীরে—ধীরে—ধীরে"।

বসন্তের মৃদু মধুর মারুত-হিল্লোলে, পল্লব রাশি পরিবৃত পুষ্প-গুচ্ছ যখন আন্দোলিত হইয়া গৃহান্তরালে অবস্থিতা বঙ্গবধূর ন্যায় উঁকি মারিতে থাকে, তখন প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, "ধীরে—ধীরে—ধীরে"।

যখন দেখি পূতসলিলা ভাগীরথী, কখনও সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া, কখনও অমল ধবল কৌমুদী জালে প্রতিভাত হইয়া মন্থর-গমনে অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন মনে পড়ে সেই শুভ-বাণী, "ধীরে—ধীরে—ধীরে"।

একটী বিদেশীয় বালক, সরোবর তীরে পুষ্পোদ্যান দর্শন করিল। পুষ্প চয়নার্থ তরুরদিকে ধাবিত হইয়া বালক দেখিল, তরুতলে এক কূর্ম্ম নিদ্রা যাইতেছে। বালকের হাতে যষ্টি ছিল কচ্ছপের প্রতি যষ্টির আঘাত করিতে বালক উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে কে যেন নীরব ভাষায় বলিয়া উঠিল,—"ধীরে—ধীরে—ধীরে"। বিবেকের উন্মাদিনী শক্তি সঞ্চারে বালকের লাঠী হাতেই থাকিয়া গেল। বালক মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া থাকিল; সে যেন "ধীরে—ধীরে" ধ্বনির নিষেধাজ্ঞা

স্রুত হইয়া পাপ কার্য্য হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইল। পাখীর মধুর কাকলীর ন্যায় এই মধুর শব্দ আমাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া গগন মার্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ উৎসাহের দীপ্ত আলোকে আলোকিত করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছে,—"ধীরে-ধীরে-ধীরে"।

লঙ্কেশ্বর রাবণ যখন ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা সূর্পণখার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া লক্ষ্মীরূপিণী সীতা দেবীকে হরণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তখন অনুজ বিভীষণ সৎপরামর্শ দানের সহিত বলিয়াছিলেন,—"ধীরে-ধীরে"। ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হওয়ায় রাবণের জ্ঞান তখন লুপ্ত; তাই, তিনি ভ্রাতার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পরিণাম যাহা হইল, তাহাও সকলেই জ্ঞাত আছেন। রাজ্যনাশ, বংশনাশ, আত্মনাশ দেখিয়া মনে পড়ে "ধীরে-ধীরে-ধীরে"।

মহাভারতেও "ধীরে-ধীরে" বাক্যের সার্থকতা বেশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। কৌরব সভায় পাণ্ডবগণের সম্মুখে যখন কুলাঙ্গনা সাধ্বী দ্রুপদ-তনয়ার কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ হইতে লাগিল, তখন স্থিরচিত্ত, সহিষ্ণুতার আধার ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেন মনে মনে বলিয়াছিলেন, "ধীরে-ধীরে"।

নারীর অবমাননায় যাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন,—নারীর গ্লানির কথা প্রকাশ করিয়া যাঁহারা "বাহবা" কুড়াইবার জন্য লালায়িত, যাঁহারা রুচিবিকারের প্রতিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াও, স্বকীয় ঘৃণ্য রুচির পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত নহেন—নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করিবার প্রয়াসী, সেই সকল বাক্যবিশারদকে আমি কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ এই দুষ্টমতি পাপাশয় দুর্য্যোধনের পরিণাম চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে গললগ্নীকৃতবাসে বলিতেছি, ভাই! "ধীরে-ধীরে-ধীরে"।

প্রকৃতির বিচিত্র চিত্রপট অথবা অতীতের অন্ধকারময় গুহাভ্যন্তর পরিত্যাগ করিয়া, এস, আমরা বর্ত্তমান ঘটনার কক্ষে প্রবিষ্ট হই, এবং "ধীরে-ধীরে" বাক্যের উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষীণ প্রাণে বলসঞ্চয় করি। আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছি, উচ্চ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছি, কিন্তু নির্ধন ব্যক্তি সহসা ধন লাভ করিলে; সে যেরূপ আত্মহারা হইয়া "ধরাখানাকে সরা"র ন্যায় জ্ঞান করিতে থাকে আমরাও তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি না? হায়! কোথায়

আমরা আর্য্যবংশধর হইয়া মহত্বের পরিচয় দিব, স্বজাতীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করিব, না, একি আমাদের ব্যবহারেই আমাদেরদেশীয় লোক লজ্জায় অধোবদন হইতেছে, আর বিজাতীয় লোকে আমাদিগকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করিয়া যেন ভবিষ্যতে সাবধান হইবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, "ধীরে-ধীরে-ধীরে"।

পুলিশ যখন অপকৃষ্ট পুরীষের ন্যায় চারিদিকে পূতিগন্ধ বিস্তার করিতে করিতে নিজ মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, ডেপুটী যখন বড় বড় নীতি গ্রন্থ মনোবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও শাসন ক্ষমতা হস্তে পাইয়া সময়ে সময়ে স্থল বিশেষে বিবেকহীনতা ও বালসুলভ চাপল্যের পরিচয় দিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কোন কোন ক্ষমতা প্রিয় আনাড়ী হাকিমপ্রবর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যখন বিচারের নামে ঘোর কলঙ্কের অবতারণা করেন, তখন কে যেন প্রাণের মধ্যে দীপকরাগে বলিতে থাকে, ভাই! "ধীরে-ধীরে-ধীরে"। চাকুরিবৃত্তি "শ্ববৃত্তি" শব্দে অভিহিত হইলেও যখন রেল কর্ম্মচারী নিরীহ যাত্রিগণের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করে না, যখন দেখিতে পাই আদালতের ছোট বড় কর্ম্মচারী নারকীয় লীলার অভিনয়ে পশ্চাৎপদ নহেন, যখন মিউনিসিপ্যালিটী যমদূতগণের পৈশাচিক ব্যবহারে সাধারণে বিরক্ত উৎপীড়িত ও ব্যতিব্যাস্ত হইয়া পড়েন, যখন দেখিতে পাই অন্যান্য বিভাগের কোন শিক্ষিত ব্যক্তিও কাল মহাত্ম্যে নিজমহত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ইহকাল কেই সারসুখের নিদান জানিয়া নির্ব্বিরোধে অপরের অনিষ্ট সাধনে নিরত তখন সেই দয়ার পাত্র ঘৃণিত নরপিশাচগণকে লক্ষ্য করিয়া কে আমাকে অলেক্ষ্য বলিতে থাকে,—"সম্মুখে অনন্তকাল বিদ্যমান রহিয়াছে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফাঁকি চলিবে না, পলাইতে পারিবে না—সমুদ্রের অতল সলিলে প্রবেশ করিলেও পরিত্রাণ নাই। কর্ম্মফল অনুসরণ করিবেই—তাই নীরব মধুর ভাষায় বলিতে থাকে—ধীরে, ধীরে, ধীরে, যাঁহারা সমাজের নেতা ও পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জনসাধারণ পরিচালিত হইবেন, যখন দেখিতে পাই, তাঁহারাও অতিনীচস্বার্থের দাস, তখন তাঁহাদের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে দেখিয়া মনে পড়ে—"ধীরে, ধীরে, ধীরে"।

যখন দেখিতে পাই, যাঁহারা ভারতের বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ী ব্যক্তি বর্গকে একতার প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ করিবার প্রয়াসী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সপরিবারের মধ্যেই তাঁহাদের মিলনের সম্পূর্ণ অভাব তখনই প্রাণের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠে, আমাদের ভবিষ্যৎ এখনও ঘোর তমসাচ্ছন্ন—"ধীরে ধীরে ধীরে"।

সমাজের শিক্ষকরূপে সংবাদপত্রের সম্পাদকের পবিত্র পদে অধিরূঢ় হইয়াও যখন দেখি পরনিন্দাপ্রিয় কোন কোন মহাত্মা সম্পাদকের আসন কলঙ্কিত করিয়া কেবল ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্ররোচনায় বশবর্ত্তী হইয়া দেশের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, তখন প্রাণের মধ্যে ভীষণ আঘাত লাগে এবং কে যেন হৃদয় ভেদ করিয়া বলিয়া উঠে পবিত্র আসনের গৌরব হানি না করিয়া চল ভাই! ধীরে ধীরে ধীরে।

যখন দেখি চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ কেবল অর্থের প্রলোভনে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত নহেন—বিবেকের অননুমোদিত পথে বিচরণ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন—যখন দেখি ধর্ম্মপ্রচারকের বেশ ধারণ করিয়া কোন কোন মহাত্মা নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে দুর্ভেদ্য প্রতারণা জালে জড়িত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তখন প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া করুণকণ্ঠে বলিতে থাকে "ধীরে—ধীরে—ধীরে।"

এইরূপ এই বিস্তৃত জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমি "ধীরে—ধীরে" এই ভাবময় আশ্বাসবাক্যের মধ্যে কি ভাবী মঙ্গলের স্পষ্ট আভাস উপলব্ধি করিতেছি। আমার নিজের জীবন ও নিষ্পাপ নহে। পদে পদে আমার অপরাধ ঘটিতেছে,—পদে পদে আমার অধর্ম্ম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হই-তেছে, প্রতি পাদবিক্ষেপে কত ভ্রম প্রমাদ ঘটিতেছে—হয়ত অকারণে আমি অপরের মনোদুঃখের কারণ হইতেছি। আমার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উদ্দিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—"ধীরে—ধীরে—ধীরে;" বিবেক যেন আমার ক্ষীণ ও মলিন প্রাণকে সজীব করিবার উদ্দেশ্যে থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিতেছে।—

ধীরে চল ধীরে চল ভাই,

পাপভরা জগৎ সংসার।

স্থিরচিত্তে, ধীরমনে,
এ সাগর হ'তে হবে পার।
ধরমের তরী ভাসাইয়ে,
তরঙ্গসঙ্কুল ভবনীরে,—
বিভুপদে, স'পিয়া পরাণ,—
ব'লে চল অতি ধীরে ধীরে।
এ সংসারে আছে কালস্রোত,
বিভীষণ ঘটণা-পবন;
তরঙ্গের কোলে, তৃণপ্রায়,
ভেসে যায় মানব জীবন।
হেথা আছে. খলতা ভীষণ,
দেয় কত কঠোর যাতনা।
ঝলকে শোণিত করে পান
যেন অহী, বিস্তারিয়া ফণা॥
শোক, দুঃখ, মনস্তাপ আছে;
আছে হেথা নৈরাশ্যের ছায়া;
বিড়ম্বনা, অত্যাচার আছে,
পার্থিব প্রণয়—মোহ, মায়া।
চারিদিকে ঝলসিছে ওই,
শাণিত কৃপাণ শত শত।
জগতের প্রতিপাশে প'ড়ে,
নিন্দা, ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা কত।
ঈশপদে রাখি; মন, চল,
ভীষণ এ পথ পানে চেয়ে।
ধীরে চল, ধীরে চল, ভাই,
ধরমের পথে ভয়ে ভয়ে।

সংসারের যেদিকে কর্ণপাত করি, "ধীরে ধীরের" অস্ফুট মধুর স্বর যেন শুনিতে পাই, কিন্তু এ মধুর রব শুনিয়া আমাদের চৈতন্য উদিত হইতেছে না। হায়! কবে আমরা ধীরে ধীরে চলিতে শিখিব? কবে আমরা বিশ্বপতিকে—জীবনপতিকে—জীবনের কেন্দ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সুপথে পরিচালিত হইব। ধীরে, ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে কবে আমাদের চিত্ত স্থির হইয়া আসিবে? কবে আমাদের প্রাণ পবিত্র হইবে? কবে আমাদের হৃদয়, স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় হইয়া উঠিবে? তখন সেই অনাবিলে বিশুদ্ধ চিত্ত কবে, "ধীরে—অতিধীরে" সেই চিত্তরঞ্জন বংশীবদন রাসরসিকের আবির্ভাবে, সাধকের আরাধ্য ধন "বৃন্দাবনে" পরিণত হইবে? "ধীরে—ধীরে—ধীরে" এই মন্ত্রের উপাসক হইয়া কবে আমরা ধীরে, ধীরে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের সমীপবর্ত্তী হইব? অহো! মন্দভাগ্য আমরা; আমাদের ভাগ্যে সে শুভদিনের উদয় হইবে কি?

দাঁড়াও দাঁড়াও।

—:০:—

(১)

রাক্ষসের এই রাজ্যে—ভীষণ প্রেতপুরে,
ফেলিয়া আমায়, দেবি! কোথা যাও, যাও!
একেলা এ মরু মাঝে,—পাপের এ কোলাহলে,—
পারি না রহিতে আর দাঁড়াও, দাঁড়াও॥

(২)

সংসারের, কুহেলিকা—কে বুঝিবে, ক্ষুদ্র আমি;—
দুর্ভেদ্য রহস্য তার বুঝে উঠা দায়।
আঁধারেতে ঢাকা প্রাণ, নেত্রে বহে অশ্রুজল,
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত ওই ভেসে যায়॥

(৩)

কে দেখাবে, কে দেখাবে, সন্মুখের ওই পথ,
ধীরে, ধীরে, হাতে ধ'রে কেবা যাবে ল'য়ে ?
কে সিঞ্চিবে শান্তিবারি—হৃদয়ের মাঝে মোর,
কেবা দিবে অন্তরের এ কালিমা ধুয়ে ॥

(৪)

সন্মুখে, পশ্চাতে, ওই যে ভীষণ অন্ধকার !
কেমনে চলিবে, বল, দৃষ্টি মাঝে তার।
আঁধারের শূন্য স্তম্ভ,—করিয়া আশ্রয় আমি,
কেমনে, কোথায় যাব, ভাবি বারবার ॥

(৫)

দূরে হেরি মরীচিকা, বিঘোর মায়ার বশে,—
আসিয়া পড়েছি, আজ বহু দূরে দূরে।
প্রেমের যে সূত্র 'ধরি,'—চলিনু গো এত পথ,
কালের বাত্যায় তাহা গিয়াছে যে ছিঁড়ে ॥

(৬)

বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত,—মা চলিতে পারি আর,
ভীষণ সংসার রণে, প্রাণে বড় ভয়।
চারিদিকে কত শত্রু, ঘুরিছে ফিরিছে, হায় !
ধর, ধর, জননি গো, দাও মা অভয় ॥

(৭)

একি গো মা, মা হইয়ে, পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
অধম সন্তানে ফেলে আগে কোথা যাও !
কোথায় কণ্টক কত, বিঘ্ন বাধা শত শত,
কিছুই না জানি, দেবি, দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥

"দিন গেল সন্ধ্যা হ'ল, বাসনায় আগুন দে।"

—:০:—

এক একটা কথার ভিতর কি শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে, তাহা বুঝা সহজ নহে। এক একটী ক্ষুদ্র কথায় এমনি শক্তি যে, সেই সামান্য কথায়ও একজন লোকের জীবনের স্রোত এক পথ হইতে অন্যপথে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে চালিত করে। নির্ব্বাপিত প্রদীপবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার নিকট ধরিলে যেমন তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ ক্ষুদ্র একটী কথার অগ্নিময়ী প্রভায় লোক বিশেষের মায়া বিজড়িত বিবেক সূর্য্য খরবেগে উদিত হইয়া প্রাণের মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয়। উপরে যে কথাটী দেখা যাইতেছে, উহাতে কি শক্তি নিহিত ছিল, তাহা চিন্তা করিয়া ভাবিবার বিষয়। এই ক্ষুদ্র কথার প্রভাবেই জনৈক সাধু মহাত্মার ধর্ম্ম জীবন গঠনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

"দিন গেল, সন্ধ্যা হ'ল, বাসনায় আগুন দে"—এই কথা বজ্রবেগে এক জন প্রকৃত বৈষ্ণবের, সংসার ত্যাগের ঠিক পূর্ব্ব সময়ে, অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অমৃত ধামে লইয়া যাইবার জন্য প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। কে তিনি, যিনি, এই "দিন গেল, সন্ধ্যা হ'ল, বাসনায় আগুন দে"—কথার সারত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতই সংসার-বাসনায় আগুন দিতে ছুটিয়াছিলেন।

কে তিনি,—যিনি নিজ জমিদারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে রজকের গৃহে রজক কন্যার মুখে "দিন গেল" শুনিয়াই কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন? কে তিনি, যিনি, বাসনানলে ইন্ধন সংযুক্ত না করিয়া বাসনার মুখে আগুন দিবার জন্য সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া শেষের সেই ভয়াবহ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন? তিনি আর কেহই নন, তিনি বিখ্যাত লালা বাবু,—সেই বৈষ্ণবের চূড়ামণি লালাবাবু। যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারিত হইলেই শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়—মনের মধ্যেতে সাধুভাবের কথা জাগরিত হইয়া উঠে—যাঁহার নাম করিলেই ফকিরের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া "ফকিরী নহে সামান্য—হ'তে হবে দীন দৈন্য" ভাবিয়া প্রাণ চমকিত হয়,—ইনি সেই লালাবাবু।

কখন্ কোন্ সূত্র ধরিয়া কাহার জীবন কোন্ পথে পরিচালিত হয়, তাহা বলা বড় দুঃসাধ্য। লীলাময়ীর লীলাচক্রের রহস্য ভেদ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিতান্ত দুরধিগম্য। আমরাও ত দেখিতেছি. প্রতিদিন, দিন যাইতেছে, সন্ধ্যা হইতেছে, আবার রাত্রির পর দিন আসিতেছে—পুনরায় সন্ধ্যা দেখা দিতেছে—তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুঃ সূর্য্যও ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইতেছে; কিন্তু আমাদের বাসনানল নির্ব্বাপিত হওয়া দূরের কথা, প্রতিদিন উগ্র প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইতেছে। বাসনার মুখে আমরা আগুন দিব কি, বাসনা খরশিখা দ্বারা আমাদিগকে অনবরত দগ্ধ করিতেছে। পুড়িতেছি—মরিতেছি,—দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের প্রাণ বাসনার অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু প্রতি-কার চেষ্টা না করিয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার তাহাতে আহুতি প্রদান করিতেছি। কোথায় আমরা নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হইয়া সংযত ভাবে ক্রমে ক্রমে বাসনা হ্রাস করিব,—কোথায় আমরা প্রবৃত্তির মূলোৎপাটনে যত্নবান হইব, তাহা না করিয়া আমরা প্রবৃত্তির প্রচণ্ড হুতাশনে আহুতি দিবার জন্য নিত্য নূতন নূতন অনুষ্ঠান করিতে বদ্ধ পরিকর হইতেছি।

"দিন গেল—দেখিতেছি; আয়ুঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, দেখিতেছি; দেখিতেছি, সুখের শৈশব অতিবাহিত;—বাল্যকালের সে প্রীতি উচ্ছ্বাসময় দিন আর নাই: দেখিতেছি, যৌবনের চমকপ্রদ কল্পনার সময়,—বিষম—সমস্যা-পূর্ণ প্রৌঢ়াবস্থা অনন্তকাল স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে; দেখিতেছি, কঠোর দুঃখের বার্দ্ধক্য সমাগত। তবুও বাসনার মুখে আগুন দিতেছি না কেন?

দিন গেল—ঐ সন্ধ্যা হইয়া আসিল—সংসারের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে—পরলোক যাইবার সময় আসিয়াছে, কি সঙ্গে লইয়া পরলোকের পথে যাত্রা করিব, এখনও তাহার উপায় করিলাম না। যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ত সংসারকে দিয়া যাইতেছি, কিন্তু আমরা কি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি? উলঙ্গ দেহে ভিখারীর বেশে আমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না—"সে দিন কেমন ভাবলি না মন, যে দিন জীবন যাবেরে। কর যত ধন উপার্জ্জন সে দন কে তোর খাবেরে। তৃণশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাকবি পরের বশে, রঙ্গরসে পালংপোষে কে আর হেসে শোবেরে,

পুষ্পাঞ্জলি।

আবার জ্ঞান শূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাকবি বলবে মড়া, ওরে জপেতে হও আত্মহারা, যদি যমের হাত এড়াবিরে ॥

কিছুই করিতে পারিলামনা, কোন চেষ্টাই করিলাম না। বাসনা-বাসনা-বাসনার বিঘোর অনলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াও পথ চিনিতে পারিলাম না; মায়াময়ীর কি মায়া প্রপঞ্চ! আর আমাদের কি কর্ম্মফল!!

ভক্তচরিত। (২)

যাঁহারা ভগবানের ভক্তসন্তান, তাঁহারাই জানেন, ভক্তি কি পরমধন। তাঁহাদের নিকট বিষয় বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হয়। প্রাকৃত বিষয়ে, তাঁহাদের মন কদাপি লিপ্ত থাকে না, তাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-সরোজের মকরন্দ পানে সর্ব্বদাই লোলুপ। আমরা বিষয়ে মুগ্ধ, অর্থই আমাদের চক্ষে একমাত্র সার পদার্থ, অতীন্দ্রিয় সুখের জন্য আমাদের লালসা নাই। ভক্ত-কি অমৃত পান করেন, কি পবিত্র নির্ম্মল সুখ উপভোগ করেন, বিষয় বিমূঢ় আমাদের, তাহা ধারণা হয়না। বিষয় বাসনা হইতে ক্ষণকালের জন্য দূরে থাকিয়া, এস ভাই আমরা ভক্ত-চরিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হই। বৈষ্ণবের "হৃদয় ভূষণ" ভক্ত মালের" ভক্ত চরিতের অমৃতাস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমরা কিয়ৎকালের জন্যও আনন্দ সাগরে ভাসিতে পারি কিনা, এস চেষ্টা করিয়া দেখি। যে উপাখ্যান আলোচনা করিতে আমরা অদ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা এই:—

পাণ্ডুরপুর গ্রামে বাঁকা নামে পতি এবং বাঁকা নাম্নী তাহার স্ত্রী বাস করিতেন। তাঁহারা অনন্য শরণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। তৃণ ও কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা অতি ক্লেশে তাঁহাদের দিনপাত হইত। ভগবদ্ভক্তের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া [illegible] ব্যথা লাগিল। তিনি বৈকুণ্ঠে ভগবানের নিকট গিয়া ভক্ত-দম্পতির দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। ভগবান বলিলেন আমি কি করিব ? আমি ধন দিতে চাহি, কিন্তু তাহারা যে পার্থিব ধন লইতে বাসনা করেনা ; পাছে পার্থিব ধন লইয়া আমাকে বিস্মৃত হয় ; তাই তাহারা সে ধনের আশা করেনা। নারদ বলিলেন তাহা কেমন করিয়া জানিব ? ভগবান পরীক্ষা করিবার জন্য একখানি স্বর্ণ মুদ্রা বনের বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, এই বনেই পতি পত্নী কাষ্ঠ আহরণ করিতেন। স্বর্ণ মুদ্রা সম্মুখে দেখিয়াও, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পতি চলিয়া গেলেন। পত্নী মনে করিলেন, পতি উহা দেখিতে পান নাই। উহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, যাহা হউক তাহার উপর ধুলা মাটি চাপা দিয়া পতিব্রতা রমণী স্বামীর অনুগমন করিলেন। বন হইতে প্রত্যাগমনকালে পত্নী, পতিকে স্বর্ণ মুদ্রার কথা খুলিয়া বলিলে, নির্লোভ পতি যেন আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"————ভাল করিয়াছ।
স্বর্ণের উপরে ধুলা মাটি যে দিয়াছ ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হইতে চলহ ত্বরায় পার হও ॥"

পত্নী লজ্জিতা হইলেন। অবশেষে উভয়েই অবিচলিত হৃদয়ে, চলিয়া গেলেন। মহর্ষি নারদ অন্তরীক্ষ হইতে এই ব্যাপার সন্দর্শন করিতেছিলেন এবং ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "প্রভো ! তোমার ভক্তের চরিত্র কে বুঝিবে ? তোমার প্রেম সুধার আস্বাদন যিনি

প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রাকৃত বিষয়ে তাঁহার মন আর আকৃষ্ট হয় কি? ভক্তের পরীক্ষা শেষ হইল, ভগবান ও নারদ, ভক্তের অপার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

আমরাও বলি-ধন্য বাঁকা! ধন্য তোমার নির্লোভতা!! ধন্য তোমার শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা!!! আমরা যে তোমার ভক্তি সুধারসের একবিন্দু লাভ করিতে পারিলেও কৃতার্থ হইতে পারি। হায়! বর্ত্তমান ভারতে কাল-মাহাত্ম্যে এইরূপ নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈক শরণ ভক্তের বড়ই অভাব। আমরা ধর্ম্মের ভান করিয়া কেবল পার্থিব ধন সঞ্চয়ের জন্য, দীনতার পরিবর্ত্তে লোকের উপর আধিপত্য লাভের নিমিত্ত লালায়িত। তাই বুঝি, আমাদের দুঃখের সীমা নাই। কপটাচারীর সুখ কোথায়?

শ্রীরাধা নাম।

গীত।

এলাইয়া একতালা।

কিবা সুধা রাধা নামে আছে!
জগৎ-মোহন, শ্রীনন্দ-নন্দন, যে নামে বাঁধা পড়িয়াছে।।
জগতের চিত্ত যে করে হরণ,
রাধানামে তার অশ্রু বরিষণ,
নামের প্রভাব, কত আকর্ষণ!
বাঁশের বাঁশী শ্যাম করে ধ'রেছে।
রাধানামে সাধা হ'য়েছে বাঁশরী,
প্রতিরন্ধ্রে ছুটে আনন্দ-লহরী,
(বলে) "জয় জয় রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী"—
রাধানামে শ্যাম পাগল হ'য়েছে।

রা, বলিতে শ্যামের নেত্রে বারিধারা,
ধা, ধা, ধা, বলিতে হয় আত্মহারা,
ভাবিনীর ভাবে হ'ল চিত্তভরা;
" সখে, ধর " বলি' ডাকিতেছে ॥
নবীন নীরদ বুকে সৌদামিনী,
হেরিয়ে গোবিন্দ, "হে কৃষ্ণ মোহিনী!"
বলিয়া ধাইছে প্রসারিয়ে পাণি;
ভ্রম দূর হয় পাছে।
(কভু) মানিনীর মান করিয়ে স্মরণ,
জানু পাতি বসি, যুগল চরণ,
ধরিবারে কর করে প্রসারণ
প্রকৃতির ভাবে রসিক হেরিছে ॥

বাঁকা মদন মোহন।

[কোন একখানি হস্ত লিখিত পুরাতন ক্ষুদ্র পুঁথি অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যান লিখিত হইল।]

বাঁকা মদন মোহন! নাম শুনিলে এখনও আমাদের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ উঠিতে থাকে। বাঁকা মদন মোহনের লীলার কথা মনে হইলে, মন, প্রাণ দুঃখের অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ডম্ফ বাদকগণ যখন ডম্ফ বাদন করিতে করিতে করুণ স্বরে " ওরূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে হে " ধুয়া ধরিয়া গান করিতে থাকে তখন কালের কুটিল গতি

ও বিধাতার বিচিত্র বিধান মনে করিয়া আমরা মর্ম্মস্পর্শী ব্যথা অনুভব করি, আর অতীতের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে থাকি—"ওরূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে হে।"

বিষ্ণুপুর রাজপুরী আজ শ্মশান ভূমি—মল্লভূমের শিরোভূষণ বিষ্ণুপুরের সুউচ্চ, সুদৃঢ় এবং সুগঠিত দেব মন্দির সমূহ, বাঁকা মদন মোহনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শোক ও বিভীষিকার লীলাস্থল হইয়াছে। কি পরিবর্ত্তন! শোকোদ্দীপক কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!! যে স্থান আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ থাকিত, সে স্থান আজ বিবাদ বিসম্বাদের রঙ্গ ভূমি। তাই বলি, কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এস ভাই, আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একসময়ে যে মদন মোহন বিরাজ করিতেন, সেই ত্রিভঙ্গ মুরারী মদন মোহনের উপাখ্যান আলোচনা করিয়া বিশাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আনন্দ উপভোগ করি।

ভক্তের ভক্তি ডোরে—ভগবান চিরকাল বদ্ধ। উত্তরাখণ্ডে ধরণীধর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বাৎসল্যরসে ব্রাহ্মণের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। ভক্তের ভগবান-ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, ব্রাহ্মণের অপত্য-স্নেহে ও অতুল অনুরাগে বদ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে বিরাজিত ছিলেন। সঙ্গে প্যারিজী ও থাকিতেন। ব্রাহ্মণ সাংসারিক পক্ষে দরিদ্র হইলেও তিনি যে অতুল ধনে ধনবান ছিলেন, তাহা দেবতারও স্পৃহনীয়। ব্রাহ্মণের সাংসারিক কোন চিন্তাই ছিলনা, বাৎসল্যভাবে বিভোর হইয়া ধরণীধর, একমাত্র মদন মোহনকেই সার চিন্তা করিয়া ছিলেন, মদন মোহনই, তাঁহার তপ, জপ, ধ্যান ধারণা, যত্ন ও অনুরাগের বিষয় ছিল।

জানিনা, কোন অপরাধে, মদন মোহন ধরণীধরকে ফাঁকি দিয়া বিষ্ণুপুরে আবির্ভূত হইলেন। বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বীর হাম্বীর, তখন মল্ল-

ভূমির রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মল্ল-ভূমীশ্বর, গৃহে বসিয়া অশেষ পুণ্য ফলে মদন মোহনকে লাভ করিলেন। নীরব নিশীথ সময়ে রাজা নিদ্রা যাইতে ছিলেন, সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া শিয়র দেশে দেখিলেন, "অপরূপ ত্রিভঙ্গ মুরতি" রাজা নয়ন ভরিয়া রূপ সন্দর্শন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে মদন মোহন বলিলেন—

"শুন বীর হাম্বীর রাজা, আমার বচন।
ধ্যান ক'রেছিলে প্রভু মদন মোহন॥
শুন রাজা, নয়ন ভরিয়া রূপ দেখ।
এক সত্য কর রাজা, আমারে লুকায়ে রাখ"॥

রাজা বীর হাম্বীরও একজন প্রেমিক ও প্রধান কৃষ্ণানুরাগী ছিলেন, মদন মোহনের কথা তিনি ইতঃপূর্ব্বে অবগত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। মদন মোহন, কৃপা করিয়া তাঁহার রাজ্যে আগমন করিলে তিনি ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সহিত তাঁহার পূজা করেন, রাজার সংকল্প এইরূপই ছিল। বহু দিনের সঞ্চিত সংকল্প আজ—সিদ্ধ হইয়াছে—রাজা মদন মোহনের মুখে "লুকাইবার" কথা শুনিয়া বলিলেন—"কৃপা করি আইলেন লুকাব কেমন কথা" তখন মদন মোহন বলিতে লাগিলেন—

"শুন শুন মহারাজ আমার বচন।
সাত দিন পরে খুঁজিতে আসিবে ব্রাহ্মণ॥"

সাত দিন পরে আমার পিতৃ স্থানীয় ব্রাহ্মণ ধরণীধর খুঁজিতে আসিবেন। তিনি আপনার হস্তে আমায় সমর্পণ করিয়া গেলে, আমি আপনার হইয়া থাকিব। প্রভু মদন মোহন, যদিও রাজার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণের প্রেম-ডোর তিনি তখনও ছিন্ন করিতে অসমর্থ। তাই রাজার স্নেহে আকৃষ্ট হইলেও, ভক্ত ব্রাহ্মণের

অনিচ্ছাক্রমে ভক্তাধীন প্রভু, রাজার হস্তে আপনাকে একেবারে " বিলাইতে " সঙ্কুচিত।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, ব্রাহ্মণ পুষ্প চয়ন করিবার পর মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, মদন মোহন নাই। মন্দির শূন্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ আকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মদন মোহন যাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তা, তিনি কি মদন মোহন বিহনে ক্ষণমাত্র সুস্থির থাকিতে পারেন? ব্রাহ্মণ বাটীর বাহির হইয়া নানা স্থানে তাঁহার উদ্দেশে অনুসন্ধান করিলেন। অবশেষে বিষ্ণুপুরের উত্তরদিকবর্ত্তিনী বিড়াই নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মদন মোহন-গত-প্রাণ ব্রাহ্মণ, যখন কোন ক্রমেই মদন মোহনের সন্ধান পাইলেন না, তখন " নদী যাহা, গঙ্গা তাহা " ভাবিয়া তিনি বিড়াইয়ের স্রোত-গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে যাইতে ছিলেন। ঘটনা ক্রমে একটী ব্রাহ্মণ মহিলা নদীতটে আসিয়া উপস্থিত, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ বিরহে যে গুরুতর কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইতে তিনি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ব্রাহ্মণীর নিকট মদন মোহনের পরিচয় পাইয়া ধরনীধর, রাজা বীর হাম্বীরের নিকট উপস্থিত হইয়া, মদন মোহনের নিরুদ্দেশ হইবার কথা বলিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া তিন দিনের মত নিজালয়ে থাকিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং মদন মোহন দিতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ, আশান্বিত হইয়া রাজ বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তিন দিন অতিবাহিত হইলে রাজা, ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া মদন মোহনের আদর্শে নির্ম্মিত অপর একটী বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখাইলেন, এই বিগ্রহের প্রকৃত নাম " শ্রীরাধাকান্ত "। ব্রাহ্মণ, এই মূর্ত্তির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন " ইহা ত মদন মোহনের

মুক্তি নহে"। তখন "মদন মোহন" "মদন মোহন" বলিয়া দুর্গা মেলার "চাকল" তলায় বসিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। রাত্রি কালে স্বপ্নাবেশে মদন মোহনের দর্শণ পাইয়া যে কথোপকথন হইল, তাহা, উদ্ধৃত কবিতাংশ হইতেই জানা যাইবে।

"মদন মোহন বলে পিতা আমায় বল কি ?
রাজা প্রেমের বেড়া দিয়াছে. বন্দী হ'য়েছি॥

ব্রাহ্মণ বলে প্রেমের বেড়ী দিবে কেমন কথা।
প্রেমের বেড়ী শুনে আমার হিয়ায় লাগে ব্যথা॥
সন্ন্যাসীর ঠাঁই ভিক্ষা মাগি পেয়েছিলাম তোরে।
পুত্র মত সেবা ক'রে রেখেছিলাম ঘরে॥
সাধ ছিল নিদান কালে বক্ষে বসাব মদন মোহন।
তোমার মুখ চাহিয়ে যেন বাহিরায় জীবন॥
সব ছেড়ে ভাবিলাম তোমার চরণ।
বৃদ্ধ দশায় ত্যাগ করিলে মদন মোহন॥"

রাজার প্রেমের বেড়ীতে আবদ্ধ মদন মোহন কিন্তু, ব্রাহ্মণের প্রতি নিষ্ঠুর হইলেন, তিনি কোন মতেই ব্রাহ্মণের গৃহে যাইতে চাহিলেন না। অবশেষে তাঁহার নির্বন্ধাতিশয্যে প্রতিদিন রাত্রি কালে ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

"তার সাক্ষ্য প্যারীজীর পালঙ্কে বসিব।
প্রত্যাবধি কাষ্ঠি আমি ফেলিয়ে আসিব"॥

ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে উঠিয়া রাজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিলেন, মদন মোহনের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা দর্শনে রাজা বিস্মিত হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রকৃত মদন মোহন দর্শন করিতে চলিলেন। ব্রাহ্মণ, মদন মোহনের ঘনকান্তি-বিনিন্দিত-নয়ন ও লক্ষ লক্ষ শশধরের শোভাধারিণী রূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া মদন মোহন বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং দর্শন জনিত সুঁখের অপূর্ণতা দেখাইয়া বলিলেন " সঙ্গেতে শ্রীমতী বিনা দর্শনে সুখ নাই " মনের মত কথা প্রাণ স্পর্শ করিয়া থাকে, যুগল ছাড়া দর্শন, পূর্ণ তৃপ্তিকর হইতে পারে না;—ব্রাহ্মণের এই মধুর উক্তি রাজার প্রাণ স্পর্শ করিল, রাজা তখন একশত মোহর আনাইয়া ব্রাহ্মণের নিকট তদ্বিনিময়ে প্যারিজীকে চাহিয়া বসিলেন। যিনি পরমার্থ ধনের অধিকারী, পার্থিব কোন ধনই তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ রাজার মুখে উক্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন—" রাধায় যদি এনে দি, তবে বাঁচায় কাজ কি ?" ব্রাহ্মণ দরণীধর, প্রাণাদপি প্রিয়ধন মদন মোহন না পাইয়া ভগ্নচিত্তে নিরাশ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

বিষ্ণুপুরে যতগুলি বিগ্রহ ছিলেন, তন্মধ্যে মদন মোহনই প্রধান। আরও সার্দ্ধ তিন শতাধিক বিগ্রহ বিষ্ণুপুর ধামে বিরাজ করিতেন। পূর্ব্বে এই বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন স্বরূপ ছিল, নানা সাধু মহান্ত তথায় আগমন করিতেন। বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি অভিরাম গোস্বামীও গুপ্ত বৃন্দাবনের কথা অবগত হইয়া হেথায় আসিয় ছিলেন। মদন মোহন কি ঘটনায় "বাঁকা মদন মোহন" হইলেন, নীচের লিখিত অংশ হইতে তাহা উপলব্ধ হইতে পারে।

"গড় মণ্ডলে অভিরাম ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
গুপ্ত বৃন্দাবন শুনি আইল দেখিতে ॥
লাল বান্দের দক্ষিণে আছে অন্দর মহল।
তাহা দেখি অভিরাম হাসে খল খল ॥
বিগ্রহ দেখিয়া সেই দণ্ডবৎ করে।
অভিরামের দণ্ডবতে ফাটয়ে ঠাকুরে ॥
ক্রোধ করি অভিরাম চারিদিক চায়।
প্রভুর মন্দির দ্বার দেখিবারে পায় ॥

শীঘ্র গেল অভিরাম প্রভুর সাক্ষাতে।
এক দণ্ডবৎ ক'রে থাকে যোড় হাতে॥
আর এক দণ্ডবৎ করি যখন হেরে।
কিছু হয় নাই ঠাকুর মন্দির ভিতরে॥
স্তুতি করি আর এক দণ্ডবৎ যখন করিল।
অভিরামের দণ্ডবতে ঈষৎ বাঁকা হৈল॥"

ভক্তের মান রক্ষা, ভগবান চিরকালই করিয়া থাকেন। ভক্ত অভিরামের ভক্তির প্রভাব দেখাইবার জন্যই যেন, মদন মোহন, তাঁহার তৃতীয় বারের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ঈষৎ বাঁকা হইয়া গেলেন। চূড়া হেলাইয়া—বঙ্কিম ঠামে, ভক্তের প্রাণধন প্রেম ভক্তির আদর্শ পুরুষ মদন মোহন দণ্ডায়মান; তখন—

"এই দেখি অভিরাম লোটায় ধরণী।
(বলে) বিষ্ণুপুরে তুমি আমি নাহি জানি॥"

বিষ্ণুপুরে রাসযাত্রার সময়ে, রাস-রসিকের রাস মন্দিরে, যে আনন্দের দৃশ্য দেখা যাইত, তাহা ভুলিবার নহে, সে সুখময় দৃশ্যাবলীর ভাব মনে করিলে, আমাদের শোকসিন্ধু উদ্বেগ হইয়া উঠে। কি ছিল, কি হইয়াছে—ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। তখন কি ছিল—

"রাস মঞ্চ ছিল শত চাঁদের বাজার।
এবে রাসতলা বন হ'য়েছে লোক চলেনা আর॥"

শুধু তাহাই নহে—

"পর্ব্বত জিনিয়া ওম্নি চল্লিশ দুয়ার।
তখন, একে একে হেরিতাম চাঁদের বাজার॥
লালজিউ বসেছেন গৌর গোবিন্দ।
এসব ঠাকুর দেখি বাড়িত আনন্দ॥
বীরসিংহের বৃন্দাবন চন্দ্র প্যারীজীর সাথে।
তিন শত ষাটি ঠাকুর বসিতেন যূথে যূথে॥

গড়গড়ির শ্যামচাঁদ আসিতেন যখন।
রোপাড়ার মদন মোহন দিতেন দরশন॥
শাওড়া কোণের রামকৃষ্ণ আসিতেন দুইভাই।
বেতুলের শ্যাম চাঁদের গুণের সীমা নাই॥
বাসুদেব পুরের বাসুদেব অতিশয় বাঁকা।
তিন শত ষাটি ঠাকুর আসি তাঁকে দিতেন দেখা॥
ষোল সম্প্রদায় নাম করিত সংকীর্ত্তন।
রাসতলা হইত যেমন শ্রীবৃন্দাবন॥"

হায়! এক্ষণে সে রাসমঞ্চও নাই, রাস-উৎসবের আনন্দ কোলাহলও নাই। মদন মোহনের সঙ্গে সবই অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর রথের সময় মদন মোহন রথারোহণে বগ্‌ড়ী গমন করিতেন সে অপরূপ দৃশ্য এই—

"প্রতি বৎসর রথের দিন আসিত যখন।
কৃষ্ণরায়ে দেখিতে ব'গ্‌ড়ী করিতেন গমন॥
প্রাতঃকালে রথে বসিতেন অনন্ত।
বামদিকে প্যারীজিউ, ডাইনে রাধাকান্ত॥
কস্তুরী চন্দন চুয়া মাখাইতাম গা'য়।
অমনি ফুলের ফুল-কাটা পঠন দিতাম তায়॥
কুসুম ধুতি পরিধান ময়ুর-মুকুট মাথে।
সোনার ঝালর আর শোভিত সাক্ষাতে॥
হাতির উপর হামার ঘরে বাজ্‌ত কত ঘড়ি।
আগে পিছে কত চলিত সোনা রূপার ছড়ি॥"

* ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। মহারাজ গোপাল সিংহ তখন মল্লভূমির অধীশ্বর। রাজা গোপাল সিংহ, পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক দুর্গ আক্রমণের বিষয় অবগত হইয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সংসারের সমস্ত বিপদ আপদ বিস্মৃত হইয়া তিনি সংকীর্ত্তন-দল লইয়া সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া

মুরের কথা, তিনি প্রহরী গণের নিকট আক্রমণ সংবাদ পাইয়াও কোন উত্তর দিলেন না ; হরিনাম সংকীর্ত্তনে ও নৃত্য গীতে বিভোর হইয়া উঠিলেন।

এদিকে আক্রমণ কারীরা, অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্ত বৎসল হরি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া ঘোটকের উপর আরোহণ করিলেন। শাঁকাকী বাজারের মধ্য দিয়া প্রভুর ঘোটক দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিল। জুজ্‌ঘাটী নামক স্থানে প্রভু অবরোহণ করিয়া দল-মাদল নামে বৃহৎ কামান স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দাগিয়া দিলেন কামানের গভীর রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল কত গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হইল। বর্গিগণ কামানের ভীষণ শব্দ শুনিয়া, ভীত হইয়া, ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন করিল। এইরূপে ভক্তের ভগবান, বর্গির আক্রমণ হইতে বিষ্ণুপুর রক্ষা করিলেন।

ইতোমধ্যে, রাজা গোপাল সিংহ প্রহরীগণের নিকট এই সংবাদ পাইলেন যে, মদন মোহনের মস্তক হইতে স্বেদ্‌ বিন্দু নির্গত হইতেছে, প্রভুর গাত্র বস্ত্র আর্দ্র হইয়াছে, মন্দিরের অভ্যন্তর বারুদের গন্ধে পূর্ণ। প্রভু সেবককে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপে কার্য্য করিয়াছেন, রাজার তাহা বুঝিতে বাকী রহিলনা। প্রহরীর নিকট হইতে উক্ত সংবাদ শ্রুত হইয়াই—

" উপস্থিত হইল রাজা প্রভুর মন্দিরেতে ॥
কবাট খুলিয়া রাজা চারি দিকে চায়।
বিন্দু বিন্দু ঘাম পড়ে মদন মোহনের গায় ॥
বারুদ লেগেছে হাতে, ধুলা লেগেছে পায়।
তা' দেখিরা রাজা অশ্রুজলে ভেসে যায় ॥
সুকোমল অঙ্গে প্রভু করিলা পরিশ্রম।
আপনার গড় রাখিল গুপ্ত বৃন্দাবন ॥ "

মল্লভূমির মদন মোহন এক্ষণে কলিকাতার বাগ্‌ বাজারে গোকুল মিত্রের বাটীতে বিরাজমান। মদন মোহনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সকল সুখ, সকল আনন্দ দূরীভূত হইয়াছে ; গ্রাম্য কবি, মদন মোহন-বিরহ-জনিত-মর্ম্ম-ভেদী দুঃখের যন্ত্রণায়, যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই :—

"আর কেন বহির্দ্বারে না বাজে ধামসা।
এক কালে সব গেল মল্লের ভরসা॥
আর কি দেখিব সেই সুন্দর আকৃতি।
ভোর ভোর শুনিব কি মঙ্গল আরতি॥
আর কেন মন্দিরেতে উড়ে নাই ধ্বজা।
হা হা মদন মোহন ব'লে কাঁদে সব প্রজা॥
এতকালে ভাঙ্গিলে প্রভু, সকল প্রেমের হাট।
তোমা বিনা শ্রীমন্দিরে লেগেছে কবাট॥
রাস দোল হয়না আর এসেনাক যাত্রী।
(কলিকাতায়) প্রেমের বেড়ী দিয়েছে গোকুল মিত্রী॥"

কবির ন্যায় আমরা মল্লভূমি নিবাসী। মদন মোহনের বিরহে আমরাও মর্ম্মাহত হইয়া আছি।

যুগল-মাধুরী।

প্রার্থনা।

আমার সে দিন। কবে বা হবে?
হৃদয় মন্দিরে, উজ্জ্বল-মধুরে—
কিশোর কিশোরী বিরাজিবে?

শ্যাম পাশে সদা বৃন্দাবনেশ্বরী,
জ্ঞান নেত্রে আমি হেরব প্রাণ ভরি,
(সদা) মানসে হেরিব, হিয়া জুড়াইব,
আধি-ব্যাধি দূরে রবে।

হেরিব মধুর যুগল-মিলন,
সফল হইবে মানব-জীবন,
দোঁহার প্রেমেতে হ'য়ে নিমগন,
পরাণ শীতল হবে।

কভু বনমালা, বনমালী গলে,
রাইয়ের গলে হেরব, মতির হার দোলে,
হেরিয়ে বিমল-আনন্দ-সলিলে,
দিবানিশি চিত ভাসিবে।

দোঁহার করে আমি হেরিব বাঁশরী,
উঠিবে তাহাতে মধুর লহরী,
অপরূপ সুধা সুখে পান করি,
প্রেতপ্ত অন্তর জুড়াইবে।

নীল পট্টাম্বর পীতবাস সনে,
কাদম্বিনী কোলে বিজলী বরণে,
শোভিবে সুন্দর উজল কিরণে,
সখী, অদূরে থাকিয়া নিরখিবে।

চরণে চরণ করিয়ে স্থাপন—
দাঁড়াইবে দোঁহে, হায়রে যখন,
তখন এ রসিক জন, ভাবেতে মগন—
করের চন্দন সখী-করে দিবে।

ফাঁকি।

—•:০—

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই কেবল ফাঁকির চেষ্টা। মানব মাত্রেই ফাঁকি দিবার জন্য একান্ত সচেষ্ট। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ কি বনিতা, সকলেই কোন না কোন ভাবে ফাঁকির চেষ্টায় ঘুরিতেছে। ফাঁকির প্রয়াস ফাঁকির চেষ্টাই, যেন মানব,—শুধু মানব, কেন— জীব মাত্রেরই স্বভাব-জাত ধর্ম্ম। ফাঁকির কার্য্য যেন জীবের কোন পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতির ফল বা বিধাতার ছদ্মবেশী মহা অভিশাপ।

কবির কল্পনাময় নেত্রে দর্শন করিলে বুঝি জড়জগতেও ফাঁকির এই বিশ্ব-ব্যাপী আয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বিনীর কোলে সৌদামিনীর লুকাচুরি—খেলা—ফাঁকির বিচিত্র রহস্য ব্যতীত আর কি বলা যায়? ঘন পত্রান্তরালে কুসুম কলিকার কভু প্রচ্ছন্ন ভাব—কভু প্রকাশিত—ভাব, যেন তাহার কোন প্রণয়ী-জনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টির চেষ্টা বা ফাঁকি মাত্র। নির্ঝরণী, পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া, আপনার ক্ষীণ দেহের পরিসর বিস্তার করিতে করিতে বৃক্ষ, লতা, পাতা, প্রস্তরাদি ভাসাইয়া, দূরে—অতি দূরে, বারিধির বিশাল দেহে, নিজ কায়া মিশাইবার জন্য ছুটিয়াছে, ত্বরিত বেগে যাইতে যাইতে ফাঁকি দিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ছুটিতেছে,—বুঝি নিজ প্রাণপতির অঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য, এখানেও কি ফাঁকির চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না? লোক সাধারণের উপকার সাধন, তাহার গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—সরিৎপতির সহিত, ফাঁকি দিয়া প্রেমালিঙ্গন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ইতর জন্তুগণের মধ্যেও ফাঁকির এই বিস্ময়কর খেলা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে ঐ যে দুগ্ধ-লোলুপ মার্জ্জার একধারে স্থির গম্ভীর ভাবে আড়ি পাতিয়া রহিয়াছে, কিসের জন্য বলিতে পারকি? উদ্দেশ্য কেবল ফাঁকি দেওয়া, ফাঁকি দিয়া কত যত্নে রক্ষিত দুগ্ধ টুকু আত্মসাৎ করা। আবার ঐ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর দিকে চাহিয়া

দেখিলেও ফাঁকির খেলা দৃষ্ট হয়। পক্ষী, রক্ষকের কত যত্নের পালিত ও রক্ষিত হইতেছে,—কেমন সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ মনোহর পিঞ্জর মধ্যে, তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—তথাপি পক্ষীর চেষ্টা,—ফাঁকি কাটিয়া উন্মুক্ত হইবার জন্য। এইরূপ যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই কেবল ফাঁকি-কেবলই ফাঁকির চেষ্টা।

ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশু, খেলা করিতে করিতে এক একবার মাতৃস্তন্য পান করিয়া লইতেছে; ভবিষ্য-জীবনে ফাঁকির বিরক্তিকর কার্য্যে পরিপক্কতা লাভেরই যেন ইহা সূচনা বিদ্যালয়ের বালক ফাঁকি দিবার জন্য সর্ব্বদাই নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনা করিতে প্রস্তুত। শিক্ষক মহাশয়কে ফাঁকি দিয়া বাহিরে যাইতে অথবা পিতা মাতাকে ফাঁকি দিয়া শিক্ষকের হস্ত হইতে কিয়ৎকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিতে বালক সতত চেষ্টিত। প্রেমিক—প্রেমিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া, মনের সুখে প্রচ্ছন্নভাবে প্রেমালাপে কাল হরণ করিতেছেন—এ স্থানেও ফাঁকির চেষ্টা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে ফাঁকি দিয়া বিষয় অধিকার করিয়া লইতেছেন; শ্যাম রামের কোন বিষয় বিনামা করিয়া রাখিতেছেন; কেন? কাহাকেও ফাঁকি দিবার জন্য।

ঐ কুঠীয়াল উপাধিধারী, গালা ব্যবসায়ী মহাজনের নিকট হইতে সহস্র সহস্র টাকা কর্জ্জ গ্রহণের পর-নিজ বিলাস ভোগে ও ভূসম্পত্তি ক্রয় কার্য্যে উহা ব্যয়িত করিয়া, একণে দেউলিয়া হইয়া ভূসম্পত্তি বেনামী দ্বারা মহাজনকে প্রতারিত করিতেছেন, এখানেও এক বিষম ফাঁকি।

স্বর্ণকার ফাঁকি দিয়া "ভরিকে" ভরি ফাঁক করিতেছেন। কর্ম্মকার বড় সুবিধা করিতে না পারিলেও চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না। ঐ মসীজীবী কায়স্থ ভায়া ঢেউ গণণার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও উৎকোচ গ্রহণের অভিনব উপায় উদ্ভাবনে নিশ্চেষ্ট নহেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও অর্থরে মোহিনী শক্তিতে দিশাহারা, আত্মহারা হইয়া যৎ কিঞ্চিৎ প্রণামী প্রাপ্ত হইলেই অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রদানে লোককে প্রতারিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। "প্রণামীর" শক্তি সঞ্চারে, মাতৃহীন বাবু উপাধিধারী ব্যক্তিগণের মস্তকমুণ্ডন বা কেশপাশ নাশের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মস্তক শোভা রক্ষিত করিবার জন্য নূতন অপূর্ব্ব বিধির বিধান করা হইতেছে—এই অধর্ম্মে—ব্রাহ্মণের এই অধঃপতনে ফাঁকির খেলা বেশই দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার ঐ গৌরিক বসন-ধারী লোকটী কখনও ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনে আসীন হইয়া, ধর্ম্মোপদেশে লোক মোহিত করিতেছেন, কখনও বা ঘোর সংসারী সাজিয়া—সংসারের মায়া মোহে বিজড়িত হইয়া, নিজ নীচ-স্বার্থ সিদ্ধি বিষয়ে কত ফাঁকির চেষ্টা করিতেছেন।

আদালতের আমলা প্রভুদের কথা বলিব কি? উহার টিকটিকিটী পর্য্যন্ত যেন উৎকোচের প্রভাব পরিবর্দ্ধনে সদাই যত্নবান্। জলৌকা যেমন মানব শোণিত শুষিয়া শুষিয়া পান করিতে থাকে, প্রভুরাও তদ্রূপ বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া—বিবিধ কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক পক্ষ ও প্রজাগণের রক্ত শোষণ কার্য্যে গুণপনা দেখাইয়া আত্ম-কলেবর পুষ্ট করিতে অগ্রসর।

উকিলের কথা কহিতে হইবে কি? তিনি ত অবিরত ফাঁকির চিন্তাতেই নিজ উর্ব্বর মস্তিষ্কের বাপের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। ফাঁকি দেখাইয়া কার্য্য সাধন করিতে, মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যার বেশ পরাইতে তিনি কেমন পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। তাঁহাকে অনেক ফাঁকির বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

বিদ্যার পবিত্র মণ্ডপেও যে ফাঁকির আবির্ভাব নাই, তাহা নহে। অর্থ সম্বন্ধে সেখানে ফাঁকির চেষ্টা না থাকিলেও অন্যান্য অনেক প্রকারে ফাঁকির কার্য্য সবেগে চলিতে থাকে। "তাম্রকূট মহদ্দ্রব্যং" ভাবিয়া পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা, ছাত্রগণের নিকট হইতে প্রাত্যহিক তাম্রকূট আদায়ের সুনিয়ম স্থাপন করিয়া ফাঁকির বিচিত্র কলেবরে নূতন বর্ণের প্রতিফলন করিতেছেন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ফাঁকির খেলা খেলিবার সুবিধা না থাকিলেও তাঁহারা অবসর অনুসারে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন অথবা বাহিরে গিয়া পরচর্চ্চায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

ডাক্তার বাবু, রোগীর গৃহে পদার্পণ করিয়া রোগীর অবস্থা শোচনীয় দেখিলেই, নিজ দর্শনীর টাকা কয়টী বিশেষ তৎপরতার সহিত আদায় করিয়া পাস কাটিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোথাও বা তিনি নিজ ডাক্তার খানা হইতে দ্বিগুণ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিয়া, রোগীর অভিভাবকের পৃষ্ঠস্থিত ভারবর্দ্ধিত করিতে বসিয়াছেন। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকিলেও, নিরক্ষর অনেক লোকই যে আজ কাল ডাক্তার সাজিয়া লোকের মুণ্ডপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ ফাঁকির তুলনা সম্ভবে না।

ডাক্তার মহাশয়ের একথা আলোচনার পর, কবিরাজ মহাশয়ের কথা বলিতে পারা যায়। তাঁহার নিকট ফাঁকির অনেক ব্যবস্থাই বর্ত্তমান। পেটের পীড়া হইয়াছে,—যাও তাঁহার নিকট ফাঁকি চাও। তিনি দুই সিকা লইয়া তোমায় ফাঁকি দিবেন। মস্তকের পীড়া, যাও তাঁহার নিকট ফাঁকির ব্যবস্থাগুণে, শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। ক্ষুদ্ররোগে ফাঁকির ব্যবস্থা দিতে কবিরাজ মহাশয়ের ন্যায় এমন পারদর্শী এ জগতে আর কেহ আছে কি ?

পুলিশ ও মিউনিসিপ্যালিটির ফাঁকির কথা, আর নূতন করিয়া বলিব কি ? একটু প্রণিধান করিলেই অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গেরও তাহা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। অতঃপর গ্রন্থকারী ও সম্পাদকী ফাঁকির কথা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিব।

গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখেন—পয়সা রোজকার জন্য, শিক্ষা দেওয়া তাঁহার মূল উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে উপদেশ দান করেন নিজেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না অথচ মুখে বলিয়া থাকেন "Do what I say but do not do what I do", এইরূপ নীরস উপদেশে কোন সুফল ফলে বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখেন, গ্রন্থারম্ভে বিনীত ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে ভাব দেখিতে না পাইয়া জনৈক ইংরাজ কবি মনোদুঃখে বলিতেছেন।

" Pride often quides the author's pen,
Books as affected are so men."

গ্রন্থকার মহাশয় নিজে যাহা করেন না, অপরকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া নিজেও যেরূপ প্রতারিত হন, অপরকেও তদ্রূপ প্রতারিত করিয়া থাকেন। ইহাও ফাঁকির একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত বটে।

বর্ত্তমান কালে সম্পাদক মণ্ডলে ফাঁকির বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা যাইতেছে। এই ফাঁকির কার্য্য দ্বারা সম্পাদকের পবিত্র আসন একদিকে যেরূপ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, অপর দিকে লোকেরও তাহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার তদ্রূপ হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়াছে। দেশের ও দশের উপকারের জন্য লেখনী সঞ্চালন করাই সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া প্রাণ ব্যথিত হয়। উপহারের ব্যবহারে ব্যবসাগিরি—বিজ্ঞাপন-বাহারে অদ্ভুত পূর্ব্ব বাহাদুরী।

অবশ্য আমি সকল সংবাদ পত্রের কথা বলিতেছি না। যে সকল সংবাদ পত্র—সম্পাদক, ফাঁকির চেষ্টায় মেকি চালাইতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের—পুণ্যের নামে পাপের—সুশিক্ষার নামে কুশিক্ষার—সুরুচির নামে কুরুচি—স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারিতার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি।

ফাঁকির কথা আর কত দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব? যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে—সেই দিকেই দেখিতে পাইবে ফাঁকি, কেবল ফাঁকি!! এ জগৎ যেন একটা মহা ফাঁকির জন্য—প্রতারণার ভাণ্ডার। এ রাজ্যে ফাঁকি দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া নিজ সম্মান, সমাজ মধ্যে, সময়ে সময়ে অক্ষুণ্নও রাখিতে পারা যায়—কিন্তু চিরদিন ফাঁকি চলেও না,—চলিবেও না। "কালের" কাছে কখনও ফাঁকি চলিবে না। "কালেরে" ফাঁকি দিয়া যিনি হাসিতে হাসিতে প্রকৃত বীরের ন্যায় এ ছার মাটীর দেহ ও মেকির রাজ্য ত্যাগ করিয়া, বিরজার পারে সচ্চিদানন্দের আনন্দ ময় ধামে চলিয়া যাইতে পারেন, তিনি প্রকৃত ফাঁকি দিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার ফাঁকি সাধু সমাজের আদরের সামগ্রী।

লোকের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া ফাঁকি কাটিতে ত প্রায় সকলেই অগ্রসর। কিন্তু হায়! এ ফাঁকির পরিনাম কি? পরিণাম—আত্ম বঞ্চনা, আত্ম নিগ্রহ—আর পাপ সঞ্চারের পথ পরিকার করা। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ "কালীর" নামে গণ্ডী দিয়া শমনকে যে ফাঁকি দিয়াছিলেন,—সেই ফাঁকি এক অপূর্ব্ব ফাঁকি—সেই ফাঁকিই প্রকৃত ফাঁকি। সত্য বটে, আমরা অতি হীন—শক্তি—বহির্মুখ ব্যক্তি, কিন্তু তাহা হইলেও এই ফাঁকির কথা আমাদের এক এক বার স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে কি? আমাদের হৃদয়ে যে মহাশক্তির বীজ রোপিত আছে,—ভক্তি সুধা সিঞ্চিত হইলে সে বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও পরে ফল পুষ্প সমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইতে না পারে, কে বলিল?

ধর্ম্মের পথে লক্ষ্য থাকিলে,—গুরুর উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সাধনার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার চেষ্টা থাকিলে, আমরাও কি এক দিন সাধক কবির ন্যায় শমনের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিতে পারি না?

'কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে, আছিরে দাঁড়াইয়ে।
শোনরে শমন তোরে কই, আমি তো আটাসে নই,

তোর কথা কেন রব স'য়ে ॥
ছেলের হাতে মেওয়া নয়, যে খাবে হমকো দিয়ে ॥
কটু বল্‌বি সাজা পাবি, মাকে দিব ক'য়ে,
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥
শ্রীরাম প্রসাদে কয়, শ্যামা মার গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাব, চক্ষে ধুলি দিয়ে ॥”
কিন্তু হায়! আমাদের সে মতি কোথায়?

প্রেম রাজ্য।

——(:০:)——

শুনিতে কি চাহ, ভাই, এ রাজ্য কেমন?
এ রাজ্য মাধুর্য্যময়, নাহি দুঃখ, নাহি ভয়,
সুধা ভরা, শান্তি নিকেতন ॥
এ রাজ্যে না আছে দ্বেষ, নাহি হিংসা, ভ্রান্তি লেশ,
কপটতা নাহি প্রবঞ্চনা।
এ রাজ্যেতে শুধু প্রেম, জাম্বুনদ যেন হেম,
নাহি হেথা মায়ার ছলনা।
কামের প্রতাপ নাই, ক্রোধ হেথা ভস্ম ছাই,
লোভ শুধু, অপ্রাকৃত-রসে।
মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এ রাজ্যেতে হীন বীর্য্য,
আত্মপর ভেদ নাহি আসে ॥
এ রাজ্যেতে নাহি কর, নাহি আছে অত্যাচার,
অর্থ লোভে শোণিত শোষণ।

ঘুষ খোর স্বার্থপর, রাজ্যের কলঙ্ক কর,
নাহি হেথা পুলিশ পোষণ ॥
প্রেমময়ী, প্রেমময়, রাজা রাণী হেথা হয়,
প্রজা হয় প্রভু-ভক্তগণ।
পরম আনন্দ কন্দ, রাতুল চরণ দ্বন্দ্ব,—
ল'য়ে তারা সেবা-পরায়ণ ॥
শুধুই আনন্দোচ্ছ্বাস, এ রাজ্যেতে পরকাশ,—
পীরিতের শুধু ছড়াছড়ি।
নেচে খেলে হেসে হেসে, আয় ভাই এই দেশে,
প্রেম-বলে ছিঁড়ে মায়া দড়ি ॥

মায়ার খেলা।

———:():———

(গান)

মা ছাড়া কি মায়ের ছেলে, মহীতলে, শান্তি কি পাইতে পারে?
বড়ই অবোধ মোরা—পথহারা, তাইতে ভুলে আছি মা'রে ॥
মায়ের কি কোন দোষ, আছে রোষ, নিজ দোষে দুষি তারে।
সদাই কুপথে যেয়ে, বাধা পেয়ে, অবিরত নয়ন ঝরে ॥
রহিয়ে খেলায় মত্ত, আত্মতত্ত্ব গেছি ভুলে নেশার ঘোরে।
হিতাহিত জ্ঞান হারা, কেঁদে সারা, তাইতে মরি ঘুরে ঘুরে ॥
ভুলিয়ে আশার নেশায়, পাপের ধরায়, "আমার" "আমার" বলি যা'রে।
দেখিতে, কালের ন্যায় কোথায় মিশায়, কোথায় বা রয় দুদিন পরে ॥
ভুলিয়ে বিষম ভুল, প্রাণ আকুল; তবু এ ভুল ভাঙ্গেনারে।
সংসারের খেলা ধূলা—মায়ার খেলা; মানুষ তা কি বুঝ্‌তে পারে?
বুঝে না মাটির দেহ ভূতের গেহ; এমনি মত্ত "খেলা ঘরে"।

বিষয়ের অভিমানে, ক্ষণে ক্ষণে, ধরা কাঁপে পদ ভরে ॥
সহিয়ে পাপের জ্বালা, ঝালা পালা, তবু ডুবে পাপ সাগরে।
ছাড়িয়ে সুধার রাশ—অভিলাষ পাপের সুখ পায় অন্তরে ॥
মানুষ রূপ কৃমিগুলা—পয়ঃমালা খুজে কেবল নেশার ঘোরে।
খাইয়ে বিষ্ঠা মূত্র, ছিন্নসূত্র, চিনির আস্বাদ্ বুঝ্‌তে নারে ॥
বলিহারী মায়ার খেল, শঠের ভেল্, 'আমি' করে মারে ছেড়ে।
পাগল কয় মনের দুঃখে, ধন্য মা'কে, ধন্য খেলা জগৎ জুড়ে ॥

রাখ্ মা !

——(ঃ০ঃ)——

আঁধার, আঁধার, গভীর আঁধার, ডুবে আছি ঘোর আঁধারে।
প্রাণে বড় ভয়, কাঁপিছে হৃদয়; কেমনে রহিব সংসারে?
অতি বিভীষণ দুঃখের জলধি; অনন্ত তরঙ্গ উঠিছে।
ভীষণ বিপদ প্রলয়—ঝটিকা, ঘন ঘন ওই বহিছে ॥
একাকী হেথায়, রহিব কেমনে? সাধের জীবণ তরনী—
ওই, ওই, বুঝি, ডুবিল এবার, দেখ্ গো করুণা—রূপিণি!
ভীষণ তাণ্ডবে—ষড় রিপু ওই, সদম্ভে, সদর্পে বিহরে।
পারি না, পারি না, করিতে সংগ্রাম, বিষম সংসার সমরে ॥
শোক তাপ রাশি, নৈরাশ্য কালিমা, পরাণে সদাই ত্রাসিছে।
(যেন) মাথার উপর, ওই কাল মেঘ, ভীষণ অশনি হানিছে ॥
এ সবার মাঝে, রহি মা কেমনে, অস্থির হইয়ে পড়িয়ে?
ডাকিছি জননি! রাখ মা অধমে, দেখ্ গো বারেক চাহিয়ে ॥
প্যারি না থাকিতে, তোর প্রেমরাজ্যে দুঃখ-অশ্রু ল'য়ে নয়নে।
পাপের এ বোঝা বহিতে বহিতে, কেঁদে কেঁদে সারা জীবনে ॥
তপ্ত আঁখি জল, দে মা মুছায়ে, কৃপাবারি দে গো তারিণি।
পথ দেখাইয়ে, দে গো দয়াময়ী! সুপথে চালাই তরণী ॥

কত মহা পাপী তোর কৃপা গুণে, তরিল বিপদ বারিণি!
তবে আমি কেন, তরিব না বল, তুই যে মা পাপনাশিনী॥
দোহাই জননি! দোহাই তোর, দোহাই জগৎ-জননি!
বিপদে তার মা, রাখ্ গো মা উমা, রাখ সর্ব্ব-দুঃখ-হারিণি॥

যুগল-মাধুরী।

———(:০:)———

(১)

একবার হের রে নয়ন।
শোভে শ্যাম পাশে মরি,
শ্যাম সোহাগিনী প্যারী,
অপরূপ যুগল মিলন॥

(২)

এরূপের না আছে তুলনা!
সৎ-চিদানন্দ রূপ,
রস-লাবণ্যের স্তূপ,
ভাষায় যে এরূপ ফুটে না॥

(৩)

হিয়া খানি করি' নিরমল—
কর রে লীলা স্মরণ,
যুগলের এ মিলন;
হবে তব জীবন সফল॥

(৪)

শ্রীযুগল অন্তরের ধন।
নিতি নব নব ভাবে,
চরণ-যুগ-রাজীবে—
সেব নিত্য সঁপি প্রাণ, মন॥

(৫)

দুঁহু-প্রেমে হও রে বিভোর।
দুঃখের সংসার মাঝে,
আন চিন্তা দূরে ত্যজে,
ভাব সদা কিশোরী, কিশোর॥

(৬)

অপ্রাকৃত রসের মাধুরী—
ভাবে ভাব মিশাইয়ে,
যুগল-পদ স্মরিয়ে,
নিরবধি রহ পান করি।

(৭)

যুগলের রাতুল চরণ—
সর্ব্বদুঃখ করে দূর,
প্রেমে মন ভরপুর ;
ইহা বিনা নাহি সার ধন।

(৮)

সুখ কোথা ? যুগল চরণে।
সংসারের পদে পদে,
শান্তি শুধু যুগল-পদে ;
পাদপদ্ম, গতি যে জীবন॥

(৯)

জড়ীয় ইতর সুখ ত্যজ।
যদি হিয়া জুড়াইবে,
পরম আনন্দ পাবে
শ্রীচরণ-যুগ সদা ভজ॥

(১০)

পূর্ণ কর উচ্চ অভিলাষ॥
ভাব যোগ্য দেহ লভি'
যুগল চরণ সেবি,—
মানসেতে কর ব্রজে বাস॥

(১১)

প্রীতি-পুষ্প করিয়ে চয়ন—
ভাবের উদ্যানে পশি,
আনন্দ সাগরে ভাসি,
সখী-করে কর সমর্পণ॥

(১২)

বাসনা মিটিবে তব তবে।
সেই পুষ্পাঞ্জলি ল'য়ে,
সখী, আনন্দিত হ'য়ে—
যুগল চরণে সমর্পিবে॥

মা ডাকেন "আয়, আয়"।

———৪:০:৪———

(১)

গভীর রজনী শেষে, ফুটিল দিবার আলো।
মা তোমার নব সাজে, ওই রে সাজিল ভাল।
মুছ ওরে অশ্রুজল, বাঁধ রে হৃদয়ে বল।
দয়াময়ী মা তোমার, ডাকিছেন অবিরল।
ডাকেন জননী ওই, মধুর মধুর স্বরে।
এখনো মায়ার বশে, কেন আছ ঘুমঘোরে ?
জগতের শোকে দুঃখে, কেঁদ না কেঁদ না আর।
"আয় আয় আয়" বোলে, ডাকিছেন মা তোমার॥

(২)

পুরব আকাশে ওই, ফুটেছে রক্তিমা রাশি।
ম' যেন আনন্দে ভোর—হাসেন মধুর হাসী॥

দশভুজা রূপে মাতা, দশবাহু প্রসারিয়া—
পাপী পুত্রে লইবারে আছেন যে দাঁড়াইয়া।
ভুল শোক, ভুল তাপ, মুছ রে নয়ন-জল।
সঘনে ডাকেন মা যে, চল ভাই ধীরে চল॥

মা'র কাছে নাই শোক, যাতনা, বিষাদ-শূল।
সেথা নাই "হা হুতাশ', সংসারের মোহ ভুল॥

নাই সেথা অন্ধকার, পরাণের হাহাকার।
দুঃখ তথা শান্তি পেয়ে, হ'য়ে গেছে একাকার॥

চিরশান্তি মা'র কাছে, তবে কেন হায়। হায়।'
ডাকিছেন মা তোম'রে—"আয় পুত্র, আয়, আয়॥'

(৩)

সুখ কি বিলাস-মদে, সুখ কি ইতর রসে?
সুখ কি ইন্দ্রিয় সুখে, সুখ কি পার্থিব যশে?
সুখ কি প্রাসাদ-বাসে, সুখ কি বিপুল ধনে?
সুখ কি রে রাজা হ'যে ব'সে রাজ-সিংহাসনে?
এ সব কি সুখ ভাই? শুধুই মায়ার খেল্।
এ সকল সুখ নয়; এ সব সুখের ভেল॥

সংসারের সুখ ল'যে য'র শুধু নাড়া চাড়া।
সে কভু না পায় শান্তি, কেঁদে কেঁদে হয় সারা॥

নিরমল শান্তি, সুখ,—আছে রে মায়ের কোলে।
মা তোমারে ডেকেছেন, তাই সুমধুর বোলে॥

ম'জ না, ম'জ না, ওরে বিষম বিষয়ে আর।
করুণা-রূপিনী ওই ডাকিছেন মা তোমায়॥

(৪)

মিছা মিছি মায়া বশে, অবস্তু লইয়া হাতে।
কি খেলা খেলিছ ব'সে, অলীক কল্পনা সাথে॥

শুধুই খেলায় মত্ত। মটীর উপর সাজ!
রক্ত মাংস নাড়া চাড়া—এ ত চামারের কাজ॥

পাপ-প্রলোভন ওই—লোলুপ মার্জ্জার প্রায়।
সুতীব্র কটাক্ষে দেখ, ঘুরে ফিরে চেয়ে যায়॥

অবোধ ছেলের মত, মত্ত "খেলা ঘরে" ?
চল ভাই, মা'র কাছে, ডাকিছেন মা তোমারে॥

লইয়ে পবিত্র প্রাণ, এসেছিলে এ ধরায়।
শত কালিমার ছায়া, লাগিয়া গিয়াছে তায়॥

শত আঁচরের রেখা, জ্বলন্ত বহ্নির মত।
মানসে তোমা'র হায়। রাখিয়া গিয়াছে ক্ষত॥

পাপের সংসারে থাকি, থাকি' পাপ-আলাপনে।
অসারে ভাবিছ সা'র, ভুলিছ সার ধনে॥

এ অশান্তি-সাগরেতে, তাই প্রাণ ভেসে যায়।
এখনো চাহিয়া দেখ, মা ডাকেন "আয় আয়।"

(৫ (

দিক্ দরশন যন্ত্র, স্থির ভাবে লক্ষ্য করি'—
অ-বে অগমে পোত— যায় যথা ধীরি ধীরি॥

ভব-জলধির নীরে, তুমিও রে সেই মত।
চালাও তরণী খানি, ধীরে, ধীরে অবিরত॥

তুলিয়া সত্যের পা'ল, লক্ষ্য ক'রে ধ্রুব জ্যোতিঃ।
আনন্দে মাতিয়া চল গাহি মাতৃনাম-গীতি॥*

হাঙ্গর কুম্ভীর সব—আসিবে যখন ঘেরে।
মার নামে দিও পাড়ি' বিপদ যাইবে দূরে॥

ঝটিকা ? ঝটিকা কি সে ? সাগর উচ্ছ্বাস আর।
আসিবে যখন কাছে—দিবে রে দোহাই মা'র॥
বিপদ বারিণী রূপে হের ওই জননীরে।
ওই শুন ডাকিছেন, মধু-বোলে মা তোমারে॥

(৬)

এ খেলা ভাঙ্গিয়া ফেল—ভেঙ্গে খেলা ঘর।
কামিনী কাঞ্চন ভুলে, শুদ্ধ প্রেমে কর ভর॥
যা হবার হোক্, কিন্তু, লক্ষ্য রাখ মা'র পানে।
চেও না ভুলনা আর, সংসারের প্রলোভনে॥
দেখ না মায়ের খেলা—আঁধারের আবরণে।
ঢেকেছে সরল পথ, ঢাকিয়াছে তত্ত্ব জ্ঞানে॥
খুল মোহ আবরণ, দেখিতে পাইবে ভাই।
কেবল মাধুর্য্য ভাতি ; আর কিছু, কিছু নাই॥
মাঝ খানে আবরণ, খুলে ফেল এই বেলা।
দুঃখ জলধির পারে, পাইবে সুখের ভেলা॥
দেখিবে মোহের পরে রূপ জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া—
দেখিবে মোহের শেষে, দশ বাহু প্রসারিয়া—
ধরণী, গগণ জুড়ে—জ্যোতির্ম্ময়ী মা তোমার।
"আয় পুত্র আয়," ব'লে ডাকিছেন বার বার॥
অনন্ত আলোক করে আলো কণা আকর্ষণ।
অনন্ত সাগর পানে, তটিনী করে গমন॥
তুমিও যাইবে যদি মা'র শ্রীচরণ পাশে।
স্থির লক্ষ্য করে ভাই চল তবে হেসে হেসে॥
পথ ভ্রষ্ট তনয়েরে লইবারে রাঙ্গা পা'য়।
শুন, শুন, ওই শুন,—মা ডাকেন "আয় আয়।"

স্বর্গের ছবি।

——:০:——

[প্রেম ও পবিত্রতা বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন।]

গভীরা যামিনী। ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ, নরনারী ঘুমে বিভোর। আমার মন চিন্তা পরিক্লিষ্ট, ঘুম আর আসে না। দেখিতে দেখিতে জগতের কত কি অচিন্তিত পূর্ব্ব ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অনন্ত বিষাদের এক অদ্ভুত একতানে প্রাণ মিলিত হইল। তন্দ্রা আসিল অমনি ক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম; কিন্তু হৃদয় যাহার অনন্ত চিন্তার আগার স্বরূপ, গভীর স্বাস্থ্য প্রদ নিদ্রা তাহার নিকট আসে না। আমার নিদ্রা হইল বটে কিন্তু সে নিদ্রা আলস্য ও আবেশ ময়—স্বপ্ন-পূর্ণ। ঘুমাইতে ঘুমাইতে যে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব, প্রাণ মোহকর। সেই প্রীতি প্রদ স্বপ্নের কথা কখনও ভুলিতে পারিব কি? সেই প্রাণ মন স্নিগ্ধ কারিণী স্বপ্নের ছায়া আমার হৃদয়ে এখনও প্রতিফলিত ও প্রতিভাসিত, ঘুমের ঘোরে ঘুম,—ঘুমাইতে ঘুমাইতে কি দেখিলাম—? দেখিলাম সুন্দর ফলচয় সমন্বিত বৃক্ষ রাজি পরিশোভিত একটি রম্য কানন। কাননের চতুপার্শ্ব অত্যুন্নত অটল প্রাচীর দ্বারা আবৃত। দূর হইতে কাননের অনেক অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া নেত্রের পিপাসা ত মিটিল না, তাই ক্রমে ক্রমে নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিলাম, কাননের প্রথম তোরণে উপনীত হইয়া দেখিলাম একজন শুভ্র বেশধারী সুন্দর বলিষ্ট পুরুষ। তাঁহার বদন মণ্ডল এক অপূর্ব্ব হাস্যময় জ্যোতিতে পূর্ণ। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোমল ভাব দেখিলে মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আমি তাঁহার নিকট যাইবা মাত্র তিনি অতি মধুর ও সরস বাক্যে আমার অভ্যর্থনা করিলেন।

আমি সেই স্বর্গীয় লাবণ্য পরিশোভিত মহাপুরুষের আপাদ মস্তক, অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম!—দেখিলাম তাঁহার শীর্ষদেশে শোভিত সুন্দর উষ্ণীষে

বিশ্বাস এই কথাটী জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে ; তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে কাননের অভ্যন্তরে এক অতি মনোহর স্থানে উপনীত হইলাম ; দেখিলাম, তথায় একজন অসীম রূপসম্পন্ন পুরুষ কোমল ভাব প্রকাশ করিয়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে ছিলেন, বিশ্বাস তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমায় বলিলেন, দেখ পথিক ! তোমার পরম সৌভাগ্য, মহাভাগ্য বলে আজ তুমি এই পবিত্র স্থানে আসিবার অধিকার পাইয়াছ ; এই স্থানের নাম "শান্তি নিকেতন" ; এই যে সম্মুখে অপরূপ লাবণ্যময় মূর্ত্তি দেখিতেছ, তাঁহার নাম "প্রেম" ; নয়ন ভরিয়া দেখিয়া প্রাণ মন পরিতৃপ্ত কর। এই অরণ্যই তাঁহার বাসস্থান। সচ্চরিত্র সাধু মহাত্মারাই এখানে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই স্থানের সকলই উৎকৃষ্ট, এখানে পবিত্রতার মৃদু মন্দ হিল্লোল সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। শান্তি এখানে নিজ পবিত্র মূর্ত্তি বিকাশিত করিয়া সংসার ব্যথিত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেন। পাপ তাপ দূর হইতে উঁকি মারিয়া চলিয়া যায়, এখানে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। এই পবিত্র স্থানে শোকের হাহাকার, পাপের সন্তাড়ন, মোহের ঘৃণ্য উন্মত্ততা, সাংসারিক আবিলতা ও আবর্জ্জনাময়ী কুটিলতা নাই। সকলের প্রতি নিরপেক্ষ ভাব প্রদর্শন করাই উঁহার কর্ত্তব্য ; পক্ষপাতিত্ব তাঁহার সীমা স্পর্শ করিতে পারে না, সকলকেই সমভাবে স্নেহ চক্ষে দেখাই উঁহার কার্য্য। তিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না। তাঁহার মস্তকে কেহ পদাঘাত করিলেও, তিনি তাহার পদ রেণু মস্তকে গ্রহণ করেন। কেহ তাঁহার প্রশংসার কথা অথবা অপযশ ঘোষণা করিলে উভয়কেই তিনি সমচক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডে কেহ চপেটাঘাত করিলে—কুপিত হওয়া দূরে থাক, তিনি বাম গণ্ডও তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দেন।

প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ও বিশ্বাসের মুখে তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া আমার সন্তপ্ত প্রাণে আনন্দের তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইল। আমি তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম, তিনি আমার বাহু ধরিয়া উত্তোলন করিলেন এবং "জীবন শান্তিময় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি বলিলাম, দেব! আমি সৌভাগ্য বলে "বিশ্বাসের" পরিচালনায় আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ

করুন। এবং এই শান্তি নিকেতনের সমগ্র অংশ প্রদর্শন করাইয়া আমায় চরিতার্থ করুন। "প্রেম" আমার অভিপ্রায় যেন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন "এস আমার অনুসরণ কর"। আমি অগ্রসর হইলাম। বিশ্বাসও যেন আমার রক্ষক স্বরূপ হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন।

প্রেমের অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়াছি, এমন সময়—অদূরে সরোবর তটে শষ্পবীথিকোপরি একটী দেবী মূর্ত্তি আসিনা দেখিলাম। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য, সর্ব্বাঙ্গে সরলতার ছটা দেখিয়া, এক অসামান্যা দেবী বলিয়াই প্রতীতি হয়। কৌতূহল বশে আমার বাক্য নিঃসরণ হইতে না হইতে বিশ্বাস আমার মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, ঐ যে অদূরে সরসী তটে লতাকুঞ্জ পরি-বেষ্টিত শষ্পবীথিকায় শুভ্র বসনা একটী রমণী মূর্ত্তি দেখিতেছ, উঁহাকে চিন কি ? উনিই প্রেমের ধর্ম্মপত্নী "পবিত্রতা"। দেখ, উহাঁর পবিত্র ভাবে সরোবর এবং তৎপার্শ্বস্থ বিটপীরাজি ও লতাবিতান কি পবিত্র মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। হস্তে যে সম্মার্জ্জণীর ন্যায় পদার্থ দেখিতেছ, উহা দ্বারা তিনি কলুষরাশি বিদূরিত করেন। কখনও বা পাপ পিশাচ তাঁহার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়া অবনত শিরে দূরে পলায়ন করে।

এই কথা শ্রবণান্তর আমি তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পবিত্র দেবীর সকাশে উপনীত হইলাম। দেবী, তাঁহাদের সমভিব্যাহারী অপরিচিত আমাকে দর্শন করিয়া, হিন্দুরমণী সুলভ লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে আমিও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হইলাম। মহাপুরুষ প্রেম আমার তাদৃশ ভাব দেখিয়া প্রকৃত মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন,—যে পথিক আমার সমভিব্যাহারে তোমার অবস্থান ভূমি সমীপে উপনীত হইয়াছে, সে অতি সরল ও অমায়িক। তাহাকে অন্যায় লজ্জার ভাব দেখাইয়া অসন্তুষ্ট করিবার অবশ্যকতা কি, সে সংসারে ক্লান্ত হইয়া আমাদের দ্বারে অতিথিরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহার কাতরতা, দীনতা ও সরলতা সন্দর্শনে তাহাকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছি। অন্যায় লজ্জা পরিহার করিয়া এই পথিকের চিত্তকে প্রসন্ন কর। ইহাতে অবিশ্বা-সের কোন কারণই নাই। সংসারের আবিলতা সে চাহে না। সে তোমার করুণার একান্ত ভিখারী। অতএব দেবি ! তাহাকে বঞ্চিত করিও না !

আমার প্রতি মহাপুরুষের প্রেমের উদার ভাব, সরল বিশ্বাস ও একান্ত অনুগ্রহ দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। আমি ভক্তিভরে দেবীর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া কাতর বচনে কহিতে লাগিলাম, মাতঃ! আমি আপনাদের করুণা ভিখারী; আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। বিপদসঙ্কুল সংসারে আমাকে কত শত্রুই যে প্রবঞ্চিত করিয়াছে তাহা বলিবার নহে, কুটিলতা, পরশ্রী-কাতরতা, অধীরতা প্রভৃতি কত অস্থির বুদ্ধি-রাক্ষসী আমায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আমি তাহাদের করাল কবল হইতে কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইয়া আপনাদের "শান্তি নিকেতনে" প্রবেশের অধিকার পাইয়াছি। জননি। হতভাগ্যের প্রতি করুণা প্রকাশে কুণ্ঠিতা হইবেন না।

পবিত্রতা দেবী সমীপে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে না করিতেই আমার দৃষ্টি কয়েকটী ভীষণাকৃতি কৃতান্ত সদৃশ রাক্ষস মূর্ত্তির উপর নিপতিত হইল ক্ষণেকে তাহাদের বিলোল কটাক্ষ ও পরক্ষণে তাহাদের সুতীব্র ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হইয়া গেল— বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবাক হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। আমি অত্যন্ত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছি জানিয়া, মহাপুরুষ বিশ্বাস আমায় আশ্বাস পূর্ণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, এখানে কোন ভীম ও পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিলে ভীত হইও না। তুমি সম্মুখে যে কয়টা ষণ্ডাকৃতি পুরুষ দেখিতেছ, উহাদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এবং অদূরে অপেক্ষাকৃত গুপ্ত স্থলে যে একটী রমণীয় রমণী মূর্ত্তি দেখিতেছ, উহার নাম কপটতা; প্রথম দর্শনে ঐ মূর্ত্তিটী সরলতা ও পবিত্রতার সজীব ছায়া বলিয়া অনুমতি হয় কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে তাহার হীনতা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহারা মানবগণকে অসৎপথে লইয়া যাইবার জন্য যে কত চেষ্টা করে, কত প্রলোভন দেখায়, তাহা বর্ণনীয় নহে; তরল বুদ্ধি যুবকগণ সহজেই উহাদের বশীভূত হইয়া পড়ে; সাংসারিক কর্ত্তব্য জ্ঞান তখন তাহাদের হৃদয় হইতে অপনীত হইয়া যায়, প্রধানতঃ, উহাদের উপদ্রবেই কত সুখের সংসার, কণ্টক সংকুল অরণ্যের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে; এবং যুবকগণের জীবন মধ্যাহ্নের স্বর্ণময় অনুরাগ বিকৃত দশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন কলঙ্কিত হয়। কিন্তু এই "শান্তিনিকেতনে"

উঁহাদের হস্ত পদ বদ্ধ ; এখানে উঁহাদের কিছু মাত্র ক্ষমতাই নাই। উঁহাদিগকে দেখিয়া তোমার আশঙ্কার কোনই কারণ দেখি না। আমি উঁহাদের বীভৎসমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে অতীব ভীত হইয়াছিলাম ; কিন্তু "বিশ্বাসের" মুখে আশ্বাস-জনক বাক্যাবলী শুনিয়া আমার সেই ভীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আমি বলিলাম, এদিকে প্রেমের অনন্তস্রাবী উচ্ছাস, অন্যদিকে পবিত্রতার শুভ্র আলোক, এইরূপ অবস্থায় উপনীত আছি—পার্থিব জগতের ঘোর অন্ধকার অথবা পাপের মলিনতা আমার আর কি করিতে পারে ? প্রেম, পবিত্রতা আমার সম্মুখে, আমার ভয় আর কিসের জন্য ! এমন সময়ে পশ্চাতে কে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল,—তাহার বিশালবদনে লোলরসনা লক্ লক্ করিতেছে। সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার শিরোদেশে জ্বলন্ত অক্ষরে "দম্ভ" এই শব্দটি লিখিত রহিয়াছে। আমি আর তাহার দিকে না তাকাইয়া নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম।

এমন সময়ে মহাপুরুষ প্রেম, অতীব মধুর বাক্যে পবিত্রতা দেবীকে বলিলেন, চল আমরা সকলে এই বিপদগ্রস্ত দীনাত্ম পথিকের বাসনা পূর্ণ করি এবং আমাদের রম্য ক্রীড়া স্থলে পথিকে লইয়া গিয়া তাহার সমগ্র অংশ প্রদর্শন করি। পবিত্রতা দেবী কতক্ষণ নীরবে ছিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার স্নেহ প্রকাশক দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া আমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব, গভীর বাসনা এবং প্রদর্শিত অনুরক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে ছিলেন। আমি তাঁহার অনুগ্রহের একান্ত প্রার্থী, ইহা যেন তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হইয়া বীণাঝঙ্কার বিনিন্দিত মধুর স্বরে কহিলেন বৎস ! তোমার মনোভাব ও লক্ষ্য আমি বুঝিয়াছি, সংসারে চারিদিকে অপবিত্রা, অশান্তি, বিপদ ও নৈরাশ্য দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে তুমি আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছ, আমরা তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। সংসারের অপবিত্র সুখে যাহারা উন্মত্ত—সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়াও আবার যাহারা পরিণাম বিরস পার্থিব সুখে নিমজ্জিত হয়, তাহারা আমাদের এই শান্তিপ্রদ মনোহর স্থানে আসিতে পারে না। তবে অনুতাপানলে বিদগ্ধ প্রাণ হইয়া যাহারা দীনভাবে আমাদের শরণাপন্ন হয়, তাহারা অনাদর পায় না। তুমি এতদিন আত্মসুখে, কামিনী-কাঞ্চনে নিতান্ত আসক্ত থাকিয়া আমাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলে, প্রধানত এই কারণেই

এতদিন তুমি আমাদের এই পবিত্র স্থানে আসিবার অধিকার প্রাপ্ত হও নাই। কিন্তু দেখিতেছি, এখন তোমার মোহ টুটিয়াছে ;—ক্ষুদ্র সুখে মত্ত ও আসক্ত হইবার বাসনা তোমার বিগত হইয়াছে। দুঃখে—নৈরাশ্যে, বিপদে—অশান্তিতে তোমার হৃদয় এতদিনে নির্ম্মল হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদে তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি। সাবধান, তুমি সাংসারিক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, উচ্চদিকে লক্ষ্য রাখিতে বিস্মৃত হইবে না, তাহা হইলে, তুমি কখন কোনও বিষয়ে পদস্খলিতও হইবে না। বৎস! আমার হস্ত ধরিয়া চল, অভিলষিত স্থান অবশ্যই পাইবে। লক্ষ্যকে হৃদয়ে সজাগ রাখিয়া [illegible] অগ্রসর হও। শত্রুগণের টীটকারী হৃদয়ের উচ্চতা ও মহত্ত্বে অগ্রা[illegible] হইবে—শরীরে ধূলি নিক্ষেপ অথবা অ[illegible] পদার্থ বিলেপন করিলেও তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া হৃদয়ের ঔদার্য্যে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে [illegible] আমার অনুসরণ কর। পথে অনেক বাধা বিঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাহাতে ভীত হইও না।

দেবীর বাক্য শুনিয়া আমি ধন্য হইলাম এবং কাতরকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলাম ; দেবি! আপনি আমার মনের ভাব সমস্তই বুঝিয়াছেন ; কিন্তু কি বলিব? প্রাণ যে, সাংসারিক মোহে কি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। আপনাদের সংসর্গে আমার সকল দুঃখ, সকল বিপদ [illegible] কুজ্ঝটিকা অপসরণের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আমি বুঝিয়াছি [illegible] নীহার কণিকার ন্যায় সদ্যঃপাতী! পার্থিব [illegible] সংসারের জালে আবদ্ধ হইতে আর আমার [illegible] ছাত্রী শান্তি কোন্ স্থানে বিরাজিতা আছেন, আমাকে সেই [illegible] চলুন।

ইত্যবসরে পবিত্রতা দেবী বিশ্বাসের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বি[illegible]! তুমি, তোমার আগন্তুককে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়াছ, আমরা তাহার হৃদয়ের ঐকান্তিকী বাসনা অবগত হইয়া শান্তি-নিকেতনের সমগ্র অংশ প্রদর্শন করিবার জন্য অঙ্গীকৃত হইলাম, অতঃপর তুমি পুনরায় নিজের কার্য্যে গমন করিতে পার। বিশ্বাস "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রণত হইল। আমিও অভিবাদন করিয়া বিশ্বাসের প্রতি অভ্যর্থনা করিলাম, তিনিও "মনোবাসনা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে আমরা তিনজনে পথাতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে পুষ্প বৃক্ষ পরিবেষ্টিত এক অতিশয় রমণীয় স্থানে উপনীত হইলাম ; স্থানটী অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চারিধারের ফুলের গাছ গুলিও যারপর নাই নয়ন তৃপ্তিকর। জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, এই স্থানটীই আমার চিরাভিলষিত শান্তি দেবীর প্রিয় বাসস্থানোপযুক্ত রম্য ক্রীড়া ভূমি। আমরা সেই স্থানে যাইবা মাত্র দুইটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবীমূর্ত্তি পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপনীতা হইলেন। তাঁহাদের দুইটীর মধ্যে একজন অন্যাপেক্ষা অধিকতর লাবণ্যময়ী ও কোমলতা পূর্ণ—বলিয়াই অনুমিত হইল। দেখিলাম, উভয়েরই আবাসস্থল বিভিন্নরূপে সজ্জিত এবং পৃথক পৃথক স্থানে সন্নিবেশিত ; একজনের বাসস্থান সূর্য্যমুখী পুষ্পের উদ্যান মধ্যস্থ লোহিত বর্ণ প্রাসাদ ; অপরের কদলীবন মধ্যস্থ একটী রমণীয় হরিৎবর্ণের সৌধ। উভয়ের বাসস্থানের এইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইলে আমি তাহাদের শোভার তারতম্য নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইলাম। সম্মুখবর্ত্তিনী রমণীদ্বয়ের মূর্ত্তিতে দেবপ্রভা প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহারা কে এবং কি জন্যই বা তাঁহারা আমাদের সম্মুখবর্ত্তিনী, ইহা জানিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আমি কৌতূহলী হইয়া মহিমবর প্রেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যে দুই দিকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান হইতে দুইটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, ইঁহারা কে? তিনি উত্তর করিলেন। উহাঁদের একটীর নাম **সহিষ্ণুতা**, অপরের নাম **সরলতা**, উভয়েই **পবিত্রতা** দেবীর প্রিয় সখী। সহিষ্ণুতার বিশেষ গুণ এই যে, ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সর্ব্বত্র আশ্রিতের যশঃ-পতাকা উড্ডীন হইয়া থাকে। ইহাঁর সেবা করিলে লোক-সংসারে প্রিয় হওয়া যায়। সংসারে নানা রূপ আপদ্ বিপদ্ বিঘ্ন বিপত্তি আছে, সংসার করিতে হইলে বাধ্য হইয়া মানবকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়। সংসারে থাকিতে হইলেই নানা লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়। কিন্তু মানব সহিষ্ণুতার পূজা না করিলে, নানাস্থলে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া পড়ে ;—এমন কি, এই সহিষ্ণুতা অভাবে মানবগণ লোক সমীপে উন্মত্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই দেবীর সেবা করে, অপণ্ডিতও ক্রমে ক্রমে তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। ভীষণ অত্যাচারী ও আপনার

প্রবল অত্যাচার এবং প্রতিহিংসেচ্ছু, আপনার পাপ-প্রতিহিংসা ভুলিয়া যায়। এই দেবীর সেবা না করিলে মানবের মন কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। ইহার অভাবে মানবের জীবনরূপ সাধের তরণীখানি অপার বিষাদ ও অশান্তি-সাগরে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। প্রত্যেক নরনারী যদি এই দেবীর সেবা করে, তবে কি এই সংসারে এত পাপ প্রবেশ করিতে পারে? তবে কি, মানব এই নীচ স্বার্থপরতায় প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি এইরূপ গর্হিত আচরণ করতঃ নিজ নিজ পদে কুঠারাঘাত করিতে থাকে? ধিক্ মনুষ্য সমাজকে; তাহারা এ হেন দেবীকে সম্মুখে জানিয়া ও দেখিয়া অন্ধের প্রায় পাপ-অশান্তি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এবং পরস্পর হলাহলময় বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এই বলিয়া পুনরায় তিনি সহিষ্ণুতার বাসস্থান সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন;— বলিলেন, এই যে অদূরে সূর্য্যমুখী পুষ্পবন দেখিতেছ, ঐ বনই উহাঁর প্রিয়-বাসস্থান; সূর্য্যমুখী যেন প্রস্ফুটিতা উর্দ্ধমুখী হইয়া ইহাঁর গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। সূর্য্যমুখী সহিষ্ণুতার বড় প্রিয়পাত্রী। সংসারের রৌদ্রজল সূর্য্য-মুখীর কিছুই করিতে পারে না; ইনি নীরবে সমস্তই সহ্য করেন; অসন্তোষ অথবা হৃদয়ের সংকুচিত ভাব নাই। ইনি সংসারের ঝড় বৃষ্টি অবাধে সহ্য করিয়াও উচ্চদিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন, এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ইনি সূর্য্যমুখী পুষ্প বৃক্ষ পরিবেষ্টিত মনোহর অট্টালিকায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

এই বলিয়া কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে প্রকৃতি মধুর বচনে কহিলেন; বৎস! আর এই যে, কোমলতাময়ী লাবণ্য-শ্রেষ্ঠা শান্তিময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহার নাম "সরলতা" উহার হৃদয়ে বক্রতার লেশমাত্র নাই। কাহাকেও প্রলোভন দ্বারা গুপ্তপথে লইয়া যাইয়া তাহার অনিষ্ঠ সাধন করিব তাহার এ চেষ্টা হৃদয়ে স্বপ্নেও স্থান পায় না। ইনি বড় মিষ্টভাষিণী। ইহাঁর সহিত মধুর আলাপে সকলেই সন্তুষ্ট হন। নীচ জন্তুও ইহাঁর কোমলভাবে সরল ব্যবহারে আপ্যায়িত এবং সঙ্গলাভে নিয়ত অভিলাষী। সুরম্য, সরল, সরস, সুগোল কদলী বৃক্ষের কোমলভাব ও প্রকৃতি দেখিয়াই যেন ইনি কদলীবন মধ্যস্থ সৌধোপরি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে দুইটী রাক্ষসী মূর্ত্তি আমার নয়ন পথের পথিক হইল। তাহারা হুঙ্কার

ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু, তাহাদের সেই উদ্যোগ অবিলম্বে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কোথায় নবাগত দেবী-দ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিব, না পাছে ঐ রাক্ষসী মূর্ত্তিদ্বয় আমার নিকটে আসিয়া আমার অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়, এই চিন্তা আমার হৃদয় অধিকার করিল। মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র দেখিলাম, তাঁহার হাস্যময় মুখ কিছু গম্ভীর ও বিরক্তি ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছে। তখনই তাঁহার নিদেশ আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইল। আমি হৃদয় দৃঢ় করিলাম ; এবং মন হইতে ভয়কে অপসারিত করিলাম। তখন আমার পরমারাধ্য "প্রেম" কহিলেন, বৎস! তুমি কেন ভীত হইতেছ? তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি, এখানে তোমার কোন ভয় নাই ; মনকে দৃঢ় কর। ঐ যে দুইটী রাক্ষসীমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহাদের নাম, **প্রতারণা ও প্রতিহিংসা।** আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলাম, ক্ষমা করিবেন, এই পবিত্র স্থানে যে উহা-দের কোন ক্ষমতাই নাই তাহা আমি জানিয়াছি, কিন্তু তবুও আমার ভ্রান্ত মন অকারণে ভীত হইয়াছিল। মহাপুরুষ, অবশেষে, সহিষ্ণুতা ও সরলতার সহিত আমার আলাপ করিয়া দিলেন ; তাঁহারাও দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন ; আমি অগ্রবর্ত্তিনী রমণীদ্বয়কে যথাযোগ্য অভিবাদন ও উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা সমাদর করিলাম এবং তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলাম ; আমার পরম সৌভাগ্য—সংসারের অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া আজ আমি দেবরাজ্যে উপস্থিত। আজ আমি আপনাদের নিকট থাকিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি, আমার প্রতি চিরদিন দয়া প্রকাশে শিথিল প্রযত্ন হইবেন না।

আমার কথা শেষ হইলে পর, পবিত্রতা দেবীর সেই মধুর ভাষিণী নবাগতা সখীদ্বয়, সমস্বরে বলিলেন, হে পথিকবর! চল, আমরা তোমাকে শান্তি শৈবলিনী-নীরে অবগাহন করাইয়া আনি। এই বলিয়া তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিলে পশ্চাদ্ দিক হইতে বাল কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। দেখিলাম, দুইটী সুন্দর বালক এবং দুইটী কুসুম কোমলা বালিকা একতানে গান করিতে করিতে আমাদের দিকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। তাহাদের পরিচ্ছদ তত সুদৃশ্য নহে। কিন্তু তাহাদের মধুরিমাময়ী মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াই মন কেমন

মোহিত হইয়া উঠিল। বোধ হয়, তাহাদের সেই নবনীত কোমল সুন্দর মূর্ত্তিগুলি অধিকতর সুন্দর করিতে অন্য কোন বস্তু অপ্রাপ্য বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বসন ভূষণে সমাবৃত রহিয়াছে। তাহাদের পরিধান বস্ত্রগুলি সমস্তই শ্বেতবর্ণ; প্রত্যেকের এক একটী কোমর বন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের কোমর বন্ধে যথা ক্রমে "বিনয়" ও "সন্তোষ" এবং "ক্ষমা" ও "দয়া" এই কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে, দেখিলাম।

তাহাদের চারি জনের মধুর মূর্ত্তি দেখিলেই অতুল গুণরাশির পরিচয় পাওয়া যায়। বিনয়ের মুখখানি সর্ব্বদাই অধোগামী। আমাদের নিকটে আসিয়া সে আমাদের তিনজনকে প্রণিপাত করিল; এবং মধুর ক্ষীণ কণ্ঠে মহাপুরুষ প্রেম ও মহিমাময়ী পবিত্রতা দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাবা! মা! আজ গোলাপ গাছে যে ফুল গুলি ফুটিয়াছে. তাহার কয়েকটী তুলিয়া দিদিদের (ক্ষমা ও দয়ার) গলায় ফুলের হারপরাইয়া দিয়াছি, হারে দিদিদের গলদেশ কেমন শোভা পাইয়াছে, সন্তোষ সদাই আনন্দ ময়। সে অতুল আনন্দ পাইয়া কেবল করতালি দিয়া থৈ থৈ করিয়া নৃত্য করিতেছে, সে কেবলই নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল, স্বর্ণহার কি করিবে, স্বর্ণ হারের আবশ্যকতা নাই। সে বলিল ভাই বিনয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও তিনি আমাদের জন্য সুন্দর পুষ্পনিচয় প্রতিদিন যোগাইতেছেন। তিনি আমাদের সুখের এবং মঙ্গলের জন্য কি না করিতেছেন? আমি বুঝিলাম উপযুক্ত পিতামাতার জন্য কি না করিতেছেন? আমি বুঝিলাম উপযুক্ত পিতামাতর উপযুক্ত পুত্রই বটে—রসাল আম্র বৃক্ষে আম্র ভিন্ন কি অন্য বিষাক্ত অথবা তিক্ত ফল ধরিতে পারে?

সন্তোষ ও বিনয়ের, মুখে অপরিমেয় হাস্য লহরী দেখিয়া ক্ষমা ও দয়া দুই ভগিনী হঠাৎ ফুল্ল লোচনা হইয়া বলিল: ভাই বিনয়। ভাই সন্তোষ! এস দেখি, আমরা তোমাদের উভয়কে ক্রোড়ে করিয়া প্রাণ মন পরিতৃপ্ত করি! এই বলিয়া, তাহারা বালকদ্বয়কে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিল এবং তাহাদের মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতৃ প্রেমের জলন্ত ছবি সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে লাগিল, এই অবস্থায় তাহারা মাতৃ-পিতৃ গোচরে মধুর স্বরে গান ধরিল;—

"মনের মত দুটী ভাইয়ে গেঁথেছে কি ফুলের মালা।
সাধের মালা গলায় দিয়ে আজ আমাদের হৃদয় আলা॥"

বালক বালিকা গণের সেই মধুর গান আমায় মোহিত করিল।

মহাপুরুষ বলিলেন, ইহাদের ক্রীড়া দেখিতেছ? ইহারা হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে অনাবিলভাবে নিয়ত এইরূপ খেলাই খেলিয়া থাকে।

অবশেষ, দয়া ও ক্ষমা, আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া অতীব বিনম্রবচনে বলিল; মহাশয়! আপনি আমাদের এই কাননে নূতন আসিয়াছেন, বাবা আপনাকে এই রম্য কাননের অনেকাংশ দেখাইয়াছেন—আমাদের উত্তর-দিকস্থ ভবন দেখিবেন কি? আমি তাঁহাদের কহিলাম, দেখ, আমি তোমাদের জনক জননীকে তোমাদের মত পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি; সুতরাং আমি তোমাদের বিনয় ও সন্তোষেরই মত একজন। আমাকে মহাশয়, আপনি প্রভৃতি পূজ্যজনোচিত সম্বোধনে অভিহিত করিলে আমি মর্ম্মাহত হইব, এজন্য আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, বিনয় ও সন্তোষের উপর তোমরা যেমন ব্যবহার করিয়া থাক, আমার উপরও তদ্রূপ ব্যবহার করিবে,—আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, আচ্ছা, তাহাই হইবে,—এই বলিয়া পুনরপি বলিল, তবে চল।

এই কয়েকটী বালক বালিকা কোথা হইতে আসিল আমার তাহা জানিবার জন্য সবিশেষ কৌতুহল জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমি এতক্ষণ কোন কথা বলিবার অবসর পাই নাই। এখন সুযোগ পাইয়া বলিলাম, সুরবালিকে! আমি তোমাদের উত্তর দিকস্থ ভবন দেখিয়া প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করি।—এই কাননের সমগ্র অংশ সুন্দররূপে দেখিতে আমার গভীর বাসনা। আমার কথার পরিসমাপ্তি হইতে না হইতে পরমার্চ্চনীয় প্রেম ও গৌরবশালিনী পবিত্রতা দেবী কহিলেন, বৎস! চল আমরাও তোমাদের সহিত আমার তনয়াদের আবাস ভূমি দর্শনার্থ গমন করি, আমি "আপনাদের এইরূপ সম্মতি শ্রবণে" কৃতার্থ হইলাম বলিয়া নীরব রহিলাম। অতঃপর সকলে অগ্রসর হইলে আমিও পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া সম্মুখে কয়েকটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও তাহার সন্নিকটে কয়েকটী অবিরল স্রাবী নির্ঝর ও নির্ঝরের

কূলদেশে একটী মনোহর গোলাপকুসুমোদ্যান সন্দর্শন করিলাম; এবং ক্রমে ক্রমে উহাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম। মহাপুরুষ বলিলেন—এই বটবৃক্ষ মূলই আমার ক্ষমার, নির্ঝরের উপরিভাগের বাটীখানি দয়ার এবং ঐ গোলাপ পুষ্প বাটীকা খানি বিনয় ও সন্তোষের বিহার ভূমি। আমি বুঝিলাম, মহাপুরুষ স্বীয় পুত্র কন্যার উপযুক্ত বাসস্থলই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের অধিকারীর গুণ ও মাহিমা স্বতঃই প্রকাশ করিতেছে।

শান্তি নিকেতনের এইরূপ রম্যস্থান সমূহ দৃষ্টি গোচর করিয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল—কিন্তু একটী বিষম কুটিল প্রশ্ন আমার হৃদয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষকে বলিলাম; দেব! আপনারা সংসারের বহুদূরে বিজনে কেন এই শান্তি নিকেতন অধিষ্ঠিত করিয়াছেন? মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, আমাদের সকলের দুইটী করিয়া রূপ। আমরা একরূপে এখানে বর্ত্তমান; কিন্তু অন্যরূপে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জাগরিত আছি। মনুষ্য এমনই অন্ধ, এমনই ভ্রান্ত যে,—চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও তাহারা কোন রূপেই আমাদিগকে দেখিবে না। তাহারা মনে করে, সংসারের পাপ-পঙ্কিল সুখই সর্ব্বস্ব। কিন্তু তাহাদের পরিণাম যে, কিরূপ ভয়াবহ, তাহা তাহাদের অননুভবনীয়। কাহারও প্রতি আমরা নিষ্ঠুরাচরণ করি না। ঈশ্বরের ধ্রুব-সত্য আদেশাবলী প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। মানব সমাজে আমাদের সমাদর দূরে থাক্, বরং অনেক সময়ে উপহাসাস্পদ হইয়াই থাকি। তাহারা ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দেয়। আমরা তাহাদের হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেলে, তাহারা সুখ বা শান্তি বোধ করে না। মনে করে, আমরা তাহাদিগকে কোন ভাবী দুঃখ সলিলে নিমজ্জিত করিতে লইয়া যাইতেছি। এমনই মনুষ্যের ভ্রান্তি! এমনই মনুষ্যের মোহ!! এই মোহ না ভাঙ্গিলে—এই ভ্রান্তি দূর না হইলে তাহাদের ভাগ্যে কি শান্তি-নিকেতনের বিমল সুখ ঘটিয়া থাকে। ভ্রান্ত মনুষ্য নরকের কীট অপেক্ষা অধম নতুবা তাহারা সুধার ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া গরল রাশি গ্রহণ করিতে প্রধাবিত হইবে কেন? অমৃত-ভাণ্ডার চক্ষের সম্মুখে থাকিলেও তাহারা তাহা না দেখিলে, আমরা কি করিব?

মহাপুরুষের কথায় বাধা দিয়া "দয়া" বলিয়া উঠিলেন; হায়! মনুষ্যের হীন দশা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! হায়! তাহারা কতকাল নীচ সুখে উন্মত্ত থাকিবে! যখন দেখি, সংসারে কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্য হাতে পাইয়া ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাহস্কারে পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, তখন তাহাদের পরিণাম ভাবিয়া আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে। যখন সংসারে কেহবা ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত হইয়া কত শত সতী রমণীর সতীত্ব হরণ করিয়া সংসারে স্বর্গরাজ্যের সুখ উপভোগ করিতেছে বলিয়া, জ্ঞান করিতেছে;—তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যায়। সংসারে যখন দেখি, কেহ বা উচ্চ রাজপদ পাইয়াও আপনার বিলাসিতায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেছে এবং কেহ প্রতারণা করিয়া অপরের ধনরাশি অশেষ কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতেছে, তখন তাহাদের ভয়াবহ চরমফল ভাবিয়া আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।--ধিক্ মনুষ্যকে! বিষ-কুম্ভকে অমৃতভাণ্ড জ্ঞান করাই, তাহাদের স্বভাব। নহিলে, দিব্যমূর্ত্তিতে আমরা সংসারের সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও, কেন তাহারা আমাদিগকে "দূর" "দূর" করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিবে? "দয়া" এই কথা বলিয়া নীরব হইলে, আমি মহাপুরুষকে বলিলাম; দেব! আপনাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া এবং আপনাদের উপদেশ সুধাপানে আমার হৃদয়ের পিপাসা শান্ত হইয়াছে; কিন্তু তবুও সংসারের দারুণ কোলাহল আর স্মৃতি আমার হৃদয় এখনও তোলপাড় করিতেছে, আমার একটী কামনা আছে—পূর্ণ করুন। অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন "বৎস! বল, তোমার কি কামনা আছে—ক্ষমতা থাকিলে এখনই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব"।—

আমি বলিলাম, 'আপনি' এবং পবিত্রতা দেবী আমার হৃদয়ে, সহিষ্ণুতা গ্রীবাদেশে, সরলতা আমার পার্শ্বে, ক্ষমা ও দয়া আমার দক্ষিণ ও বাম করে উপবেশন করুন। সন্তোষ ধমনীতে ও বিনয় শিরোদেশে অধিরোহণ করুন, আমি—এই কলেবরের মধ্যে আপনাদিগকে একত্রে দিব্য চক্ষে দর্শন করি। মহাপুরুষ 'তাহাই' হইবে; বলিয়া, সপরিবারে একে একে আমার অঙ্গে ও হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন;—নীরাশার অন্ধকারে আমার হৃদয়ের স্বর্গীয় সুখের মুকুলটী, যাহা এতদিন গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা আজ প্রস্ফুটিত হইল। আর কোন অন্ধকার কোন মোহ কোন কোলাহলই নাই। সম্মুখে কেবল জ্যোতিঃ

অনন্ত জ্যোতিঃ—অনন্ত আলো দেখিলাম, সেই অপূর্ব্ব অনন্ত জ্যোতি মধ্যে কি দেখিলাম, দেখিলাম—একটি স্থির রজতধবলা নির্ঝরিণী, দুইপার্শ্বে ঘন পল্লবাবৃত ও বিবিধ পুষ্প ফল শোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া নির্ঝরিণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, বুঝিলাম কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "শান্তি" এই স্থানেই নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই শুভ্র শান্ত পবিত্র নির্ঝরিণীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইল। আমার এইরূপ বাসনা হইবা মাত্র জোয়ারের ন্যায় নদীর জল যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—আমিও অগ্রসর হইলাম। ক্রমে ক্রমে সেই জলে আমার জানু, উরু, কটি—ক্রমে শিরোদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্নপ্রায় হইল, দেখিতে দেখিতে আমি সম্পূর্ণরূপেই নিমগ্ন হইলাম—শান্তি সিন্ধুনীরে আমি ডুবিয়া গেলাম—ডুবিয়া ডুবিয়া যেন দুর্ল্লভ সুধা-পান করিতে লাগিলাম। ডুবিয়া ডুবিয়া কেবল আলো,—কেবল সুখের প্রস্রবণ দেখিতে লাগিলাম,—ডুবিয়া ডুবিয়া সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আপনাকে আর মনে নাই—আমি নিজেই যেন শান্তির পবিত্রস্থ র বলিয়া অনুমিত হইতেছি—অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল॥

চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমি আমার চিরপরিচিত শয্যার উপর তেমনি শায়িত রহিয়াছি। সূর্য্য উদিত হইয়াছে, নরনারী অনেকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রধাবিত হইতেছে, রাজপথ কোলাহল-পূর্ণ?—এ কি? কোথায় প্রেম, কোথায় পবিত্রতা কোথায় বা সেই রম্য কানন। দেবপুত্র বিনয় ও সন্তোষ, দেবকন্যা ক্ষমা ও দয়াই বা কোথায়, এবং কোথায় বা সেই শান্তি নির্ঝরিণী? আমার সেই পথ প্রদর্শক বিশ্বাসই বা কোথায় তিরোহিত হইলেন? আমি যে শয্যায় প্রতিদিন শুইয়া থাকি, আজিও সেই শুষ্ক, কঠোর, কণ্টকাচ্ছন্ন শয্যায়! হরি—হরি—কি কুহক স্বপ্নের কি মোহিনী মূর্ত্তি! স্বপ্ন দৃষ্ট সেই সুন্দর—অতি সুন্দর—"স্বর্গেরছবি" গুলি এখন কোথায়? তাহার ছায়া আমার হতাশ তাপদগ্ধ হৃদয়ে আর একবার প্রতিবিম্বিত হইবে কি?—

বাবা মনোহর।

[শ্রীশ্রী৺মনোহর দাস ঠাকুর জিউএর শ্রীচরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।]

[বাবা মনোহর দাস, নিত্যানন্দ পরিবার ভুক্ত। নিত্যানন্দ ভক্ত মাত্রেই বাউল (বাতুল প্রেমের পাগল) বা আউল। ইঁহার নামান্তর চৈতন্য দাস। "সারাবলী" গ্রন্থে ইঁহার এইরূপ উল্লেখ আছে।—

আদিনাম মনোহর চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ ও বিদেশ॥

ইনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে নানাস্থানে বাস-ভবন স্থাপন করিতেন; ইঁহার নিদর্শন অনেক স্থানেই 'বাবা আউল মনোহর পাট" দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রথমে বনবিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবরাজা বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন, এবং উক্ত রাজার দ্বারপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ইঁহার বন্ধু ছিলেন।

ইনি নির্লোভ ও ইচ্ছাময় পুরুষ ছিলেন। ইঁহার কোন ধন সম্পত্তি ছিল না। এবং কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না। অথচ ইঁহার আখেরায় সদাব্রত ছিল। বাঁকুড়া জেলাস্থ সোনামুখী গ্রামে "বাবা আউল চাঁদ দাসের পাট" বলিয়া একটী আখেরা আছে। অনেকে মনে করেন এটীও মনোহরের সাময়িক বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানে চৈত্রমাসে রামনবমী তিথিতে প্রতি বৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। ইনি "পদসমুদ্র" ও "শির্য্যাসতত্ত্বের" সংগ্রহকার। কেহ কেহ বলেন, পদসমুদ্রে মনোহর দাস ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহা ইঁহারই রচিত; "দিনমণি চন্দ্রোদয়" নামে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী ১৪১ পৃষ্ঠা।]

(১)

"মনোহর" মধুমাখা নামটী সুন্দর।
মানবের মন হর,
তাই বুঝি নাম ধর,—
"মনোহর" হে বরণ্য সাধক প্রবর॥
"মনোহর" মধুমাখা নাম কি সুন্দর॥

(২)

দীন আমি প্রকাশিতে মহিমা তোমার
না আছে শকতি মোর,
পাপেতে সদা বিভোর,
নিজগুণে স্বপ্রকাশ, পবিত্রতাধার।
মহিমা প্রচারি আছে কি শক্তি আমার?

(৩)

অপবিত্র দেহ মোর, অবিশুদ্ধ মন!
তোমার স্মরণে পূত,
ভকতি কণিকা যুত—
হইতে, এসেছি প্রভো, পরশ রতন—
সংযোগেতে লৌহ যথা কাঞ্চন বরণ॥

(৪)

তুমি আছ সোনামুখী পবিত্র করিয়া,
তুমিই গৌরব তার,
ওহে ভক্তি প্রেমাধার,
গৌরবের ধন আর না পাই খুঁজিয়া।
তুমি আছ সোনামুখী পবিত্র করিয়া॥

(৫)

"শ্যামরায়" শ্রীচরণে লইয়া শরণ—
সাধিলে ভজিলে তুমি,
হইলে অন্তর যামী,
যুগলের পাদপদ্মে ত্যজি তনুমন।
শিখাইলে জীবগণে আত্ম সমর্পণ॥

(৬)

শ্যাম রায়, বাঁধা তব প্রেম আকর্ষণে,
বদ্ধ সদা প্রেমডোরে,
মহিমা প্রচার করে;—
ভক্তাধীন, ভকতের গৌরব বর্দ্ধনে,
রত অবিরত কে না জানে ত্রিভুবনে॥

(৭)

কত দূর দেশ হ'তে সাধু মহাজন—
গুণের কাহিনী শুনি,
হে ভকত শিরোমণি,
আসে তব সন্নিধানে, পুলকিত মন।
ধন্য তব প্রেম ভক্তি কঠোর সাধন॥

(৮)

সহস্র সহস্র ভক্ত শিষ্য দলে দলে—
ল'য়ে "দুধ চিঁড়া" ভার,
তব প্রীতি উপহার,—
লইয়া পনস, আম্র, বিল্ব শতদলে।
আসে নিবেদিতে তব চরণ কমলে॥

(৯)

তেজোময় হুতাশন ভস্মে আচ্ছাদিত,
কিম্বা যথা প্রভাকর,
জলদে আবৃত কর,
অথবা খনির গর্ভে মাণিকের মত,—
রেখেছিল গুপ্তভাবে গুপ্তধন যত॥

(১০)

বাহিরে কৌপীন মাত্র ছিল হে তোমার,
অন্তরে ভকতি ধন,
অমূল্য মহারতন—
যত্নে ছিল, কে রাখিত সন্ধান তাহার।
নীরবে নিষ্ঠার ভাবে সাধন তোমার॥

(১১)

তোমার মহান্ ভাব শুদ্ধ প্রেমরসে—
জানিয়া বুঝিয়া লোকে,
অনুরাগে মহাসুখে,—
ছুটিছে তোমার পানে মাতিয়া হরষে।
দুঃখ, তাপদূর হয়, চরণ পরশে॥

(১২)

সত্যবস্তু গুপ্তভাবে থাকে কত কাল।
তোমার বিশুদ্ধা ভক্তি—
প্রকাশিল নিজ শক্তি,
প্রভাকর, পরকাশে যেন প্রভাজাল।
সত্যবস্তু গুপ্তভাবে থাকে কতকাল?

(১৩)

কতলোক, কতরূপে মনের বাসনা,—
পূরাতে তোমার স্থানে,
পুলক পূরিত প্রাণে—
আসিয়া হতেছে তারা সফল কামনা।
দূর ক'রে মনোদুঃখ প্রাণের বেদনা॥

(১৪)

শ্রীরামনবমী দিনে তনুত্যাগ করি,—
অপ্রকাশ হ'লে তুমি,
ওহে সর্ব্ব শুভ কামি!
ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন সেই দিন স্মরি,
স্থূল দেহ খানি রক্ষাকরে, যত্ন করি।

(১৫)

সমাধি মন্দির তাহে করিয়া স্থাপন,
নবমীতে প্রতিবর্ষে,
সোনামুখী বাসী হর্ষে,
মহোৎসবে মত্ত হয় আনন্দে মগন
ভকতের প্রতি ভক্তি করিয়া জ্ঞাপন।

(১৬)

মন্দির ভিতরে হেরি দিব্য সিংহাসন।
রাঙ্গা পাদুখানি শোভা,
ভক্তজন মনোলোভা—
কাষ্ঠের পাদুখানি তাহে কিবা সুশোভন
হেরিলে স্মরণ হয়, যুগল চরণ॥

(১৭)

ক্ষুদ্রাকারে ছিল এই উৎসব সুন্দর।
ভকতের মহিমায়,
ক্রমেতে বিপুলকায়,
হইল তাহার, আজ দৃশ্য মনোহর!
আগে ছিল ক্ষুদ্র এই উৎসব সুন্দর!!

(১৮)

উৎসবের নামে নেচে উঠে তনুমন।
আনন্দে প্রফুল্ল হ'য়ে,
নরনারী আসে ধেয়ে,
উৎসবের ক্ষেত্রে সবে করে দরশন।
অসীম 'সুখের' নীরে হয় নিমগন॥

(১৯)

এ উৎসব নেহারিতে বৈষ্ণবের দল,
আসে নানাস্থান হ'তে,
আশা উল্লসিত চিত্তে,
'হরিবোল' মুখরিত করে জল স্থল।
গৌরনামে মাতোয়ারা ফেলে অশ্রুজল ॥

(২০)

বৈষ্ণব আখেরা ধরে দৃশ্য সুখময়।
শ্রীচৈতন্য গুণগানে,
সুমধুর সংকীর্ত্তনে,
অনুরাগী বৈষ্ণবের প্রশস্ত হৃদয়।
অঙ্গে অঙ্গে আঁখি যুগে হয় ভাবোদয় ॥

(২১)

উৎসবের ক্ষেত্রে মরি কি ভাব নেহারি!
একযোগে একস্থানে,
নরনারী একপ্রাণে—
অন্নথাল ভোগ ল'য়ে করে হুড়াহুড়ি।
উৎসবের ক্ষেত্রে মরি কি ভাব নেহারি॥

(২২)

বৈষ্ণব কাঙ্গালী সেবা অপূর্ব্ব দর্শন।
হেরি এই মহোৎসবে,
হৃদয় মাতান ভাবে—
পূর্ণ হয়, পাই হাতে অপরূপ ধন।
বৈষ্ণব কাঙ্গালী সেবা দৃশ্যবিমোহন ॥

(২৩)

হে প্রেমের শিরোমণি বৈষ্ণব প্রবর।
তোমার মহিমা কথা,
অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা—
হেরিয়াছি, হেরিতেছি মানস নয়নে।
সে মহিমা ভালজানে "তন্তুবায়গণে ॥"

(২৪)

কি তাদের ভালবাসা সরলতাময়।
তারা তব চিরপ্রিয়,
উৎসবেতে বরণীয়,
তাইতে "গণ্ডীর টাকা" যতনের ভরে,
সঞ্চিত করিয়া রাখে ধনের ভাণ্ডারে।

(২৫)

কুলীন কন্যারে দিয়ে কুলীনের ঘরে
যে মহিমা প্রকাশিলে,
সে কাহিনী মনে হ'লে,
পুলক উচ্ছ্বাস আসে মনের মাঝারে ?
তোমার মহিমা বল কে বলিতে পারে ?

(২৬)

"কূপজলে" আঁকা তব মহিমার কথা,
"অকালে কাঁঠাল পাকা,"
কি মহিমা যায় দেখা,
কড়িকাঠ বেড়ে উঠে মহিমার গুণে।
আরো কত শুনিয়াছি এ ক্ষুদ্র জীবনে ॥

(২৭)

হে করুণাময় প্রভো! বাবা মনোহর ;
তুমি প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ,
আমি অতি অপকৃষ্ট,
একবিন্দু প্রেমদানে হে ভক্তপ্রাণেশ।
অধমজনের কর জ্ঞানের উন্মেষ॥

(২৮)

আমি যে কাঙ্গাল অতি কি আছে সম্বল।
হৃদয়ের এক কোণে,
তুলিয়া ভাব প্রসূনে,
ভকতি চন্দনে মাখি, দিলাম চরণে।
লহ অর্ঘ্য, লহ প্রীতি, কৃপাকর দীনে॥

প্রস্তুত হও।

—:০:—

(১)

একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মৃত্যুর একটা বিভীষিকাময়ী ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—একটু স্থিরভাবে কর্ণপাত করিলে ধ্বংসের একটা বিশ্বব্যাপী মহা কোলাহল ধ্বনি যেন শ্রুতি গোচর হইতে থাকে, বস্তুমধ্যগত এই বিভীষিকার ছায়া এবং বিশ্বব্যাপী এই মহা কলরব আমাদিগকে সর্ব্বদা বলিয়া দিতেছে "হে মানব, প্রস্তুত হও।" জড় জগতের ধুলিকণা হইতে উচ্চ প্রাসাদ ও বিপুলকায় পর্ব্বত, জীব জগতের ক্ষুদ্র কীট হইতে শ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত, সকলেই আমাদিগকে "প্রস্তুত হও" "প্রস্তুত হও" বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। আমরা কিন্তু মহামায়ার মহামায়াতে এমনি প্রমত্ত,—মহাশক্তির বিষম মায়াজালে এরূপভাবে বিজড়িত যে, সে মায়াজাল ছেদন করিয়া অন্ধকারের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া ভবিষ্যৎ আলোকের আশ্বাসপ্রদ বাণীও শুনিতে পাইতেছি না। জগতের চারিধারে প্রত্যেক বস্তু আমাদিগকে অনন্ত জীবনের জন্য "প্রস্তুত হও" বলিতেছে—প্রস্তুত হওয়া দূরের কথা, আমরা দিন দিন সুপথে কেবল কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছি মাত্র।

ওই দেখ, আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, প্রবল বাতাস আসিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল; গৃহ পুনরায় আঁধারে পূর্ণ হইল, যে আঁধার সেই আঁধারই থাকিল, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার সময় আমাদিগকে বলিয়া গেল—"প্রস্তুত হও," "প্রস্তুত হও"।

ওই সুষমার আধার গোলাপের দিকে চাহিয়া দেখ! বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূমিতলে, রৌদ্রতাপে, তাহার কি পরিবর্ত্তন!! সুন্দর কোমল দেহ আজ মলিনতা পূর্ণ, কুসুম রত্ন গোলাপ শুকাইতে শুকাইতে নিজ সৌন্দর্য্য হারাইয়া— সজীবতা হৃত হইয়া বলিতেছে জীব, "প্রস্তুত হও"।

ঐ দেখ বৃক্ষের তলদেশে পত্রগুলি শাখাচ্যুত ভূলুণ্ঠিত ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া, নিজ পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হারাইয়া বলিতেছে "প্রস্তুত হও"—"আজ আমাদের যে দশা, তোমাদেরও তাহাই," "প্রস্তুত হও"।

এইরূপ, যে দিকে দৃষ্টিগোচর করিবে, সেই দিকেই ধ্বংসের প্রভাব বিস্তৃত দেখিতে পাইবে।

ওই হতাবশেষ রাজপ্রাসাদের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে—কালের কি মহাশক্তি তাহাকে এরূপ অবস্থায় আনিয়াছে। প্রমোদ ভবন আজ লূতাজালে বেষ্টিত হইয়া পেচককুলের আবাস স্থল হইয়াছে,— নন্দনকানন সদৃশ রাজোদ্যান আজ নানা আগাছায় পূর্ণ হইয়া অতি ভয়াবহ স্থান হইয়া উঠিয়াছে—রাজা যে স্থানে পারিষদ্গণ বেষ্টিত থাকিয়া ন্যায়দণ্ডের পরিচালনা করিতেন, সে স্থান ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকুলের আশ্রয় স্থল হইয়াছে—নানাবিধ মণিমাণিক্যে যে রাজভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, তাহা আজ প্রস্তর কণার রাশিতে পরিপূরিত। এই অচিন্তনীয় ধ্বংস—কালের অপ্রতিবিধেয় হস্তের শোচনীয় সন্তাড়ন, আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে, কেবল "প্রস্তুত হও"—"অনন্ত জীবনের জন্য "প্রস্তুত হও"। তারপর একটীবার শ্মশানের দিকে নেত্রপাত কর। কি দেখিবে, দেখিবে শেষের জন্য আয়োজন সংগ্রহের বিপুল ক্ষেত্র। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে এরূপ উপকরণ জগতের আর কোথাও পাইবে না। তাই বলি ভাই, একটীবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—ঐ শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে! দেখ, রূপ পুড়িতেছে,— যৌবন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে—মান ভস্মীভূত হইতেছে, গর্ব্ব চূর্ণ হইতেছে, থাকিতেছে কেবল ভস্ম, আর কিছুই না, কেবল ভস্ম। নারীর কোমল নধর কান্তি দেখিতে দেখিতে কোথায় বিলীন হইল, পুরুষের অহঙ্কার, উন্নত বক্ষ আজ কোথায় রহিল? ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার গর্ব্ব কোথায় থাকিল? শ্মশানের ভীষণ চিতানলে কিছুই থাকিতেছে না,—থাকিতেছে কেবল ভস্ম, ভস্ম, দগ্ধ

চিতার ভষ্ম মাত্র। আর সেই ভষ্ম স্তূপ থাকিয়া থাকিয়া কি যেন কি গভীর ভাবে নীরবতার রাজ্যে নীরব সঙ্গীত গান করিয়া বলিতেছে "প্রস্তুত হও," "প্রস্তুত হও" "প্রস্তুত হও"।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে শৌর্য্য বীর্য্যশালী বীরগণ জগতের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন "প্রস্তুত হও"।

ওই দেখ মহামারী প্লেগ, বিভীষিকার জীবন্ত মূর্ত্তি ওলাদেবী আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে বলিতেছে—"প্রস্তুত থাক, জীব, "প্রস্তুত থাক,' "মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা তোমাদের কুক্ষিগত করিয়া লইব"—প্রস্তুত থাকিও"।

ওই প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা—নিদারুণ মহীকম্প ঘন ঘন উদিত হইয়া আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য অঙ্গুলি সন্তাড়নে বলিয়া দিতেছে "জাগো—জাগো প্রস্তুত হও"।

আবার ভাবিয়া দেখ, মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। কি সুখের শৈশবে কি কৈশোরে কি যৌবনে কি প্রৌঢ়াবস্থায় সকল সময়ে মৃত্যু গুপ্তভাবে আসিয়া ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে মৃত্যুর স্থান অস্থান বোধ নাই,—সে রাজা প্রজা মানে না, কি অট্টালিকা বাসী মহারাজা,—কি পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র সকলের নিকটেই মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আসিতেছে— আর ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিতেছে "প্রস্তুত হও"।

এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সাধক কবিগণ তারস্বরে বলিয়া দিতেছেন—
"ভাই সব, প্রস্তুত হও,"—"পথের সম্বল সংগ্রহে যত্নবান হও"।

কেহ বলিতেছেন—"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আযোজন॥"

কেহ বলিতেছেন—"সে দিন কেমন, ভাব্‌লি নারে মন, যেদিন জীবন যাবেরে।
কর. যত ধন উপার্জ্জন, সে ধন তোর কে খাবেরে॥"

কেহ বলিতেছেন—"শেষের সেদিন মন, কররে স্মরণ, ভবধাম যেদিন ছাড়িবে।
সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে॥"

আবার কেহবা বলিতেছেন—"একদিন হায় এমন হবে এ মুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধর্‌বে না, এ চরণে আর চল্‌বে না॥"

মানব জীবন ও মানব দেহের পরিণাম চিন্তা করিয়া ফকির কবি ফিকির শিক্ষা দিবার জন্য বলিতেছেন—

"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা লাট বহরা জাত বেহারার কাঁধে তুলে॥"

(২)

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকের প্রত্যেক বস্তু আমাদিগকে অস্ফুট ভাষায় বলিয়া দিতেছে "প্রস্তুত হও,"—"প্রস্তুত হও,"—"শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের জন্য।" কিন্তু আমরা প্রস্তুত হইব কেমন করিয়া? প্রস্তুত হইবার উপায় কি, উপকরণ কি? কি সম্বল সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের ঠিক্ প্রস্তুত হওয়া হইবে? এ ঘোর কলিযুগে মানব প্রস্তুত হইবে, কি করিয়া?

প্রস্তুত হইবার উপায় আছে আয়োজন সংগ্রহ করিবার সুবিধা ও অবসর রহিয়াছে। এ কলিযুগে নামের জোরে জীব উদ্ধার হইবে। কলিযুগের প্রাধান্য দেখাইয়া তাই সনাতন দাস কলিযুগকে যুগসার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে যে একটী উপাখ্যান আছে তাহা এই—"কোন যুগ প্রধান" এই বিষয় লইয়া একদিন ঋষিগণের মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল, প্রথমতঃ কিছুতেই সে তর্কের মীমাংসা হইল না। অবশেষে সকলে, সন্দেহ নিরসণ জন্য মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জাহ্নবী জলে অর্দ্ধস্নাত হইয়া ছিলেন। তাহা দেখিয়া মুনিগণ জাহ্নবী তটে তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। মহামুনি বেদব্যাস স্নানানন্তর উত্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ধন্য ধন্য কলিযুগ"। তিনি পুনর্ব্বার মজ্জনানন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "শূদ্র জাতিও ধন্য৹ বাদার্হ" এই বলিয়া পুনরায় মজ্জন করতঃ "স্ত্রী জাতি ধন্যা" এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিলে ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! আপনি স্নান করিতে করিতে কলিযুগকে, শূদ্র জাতিকে ও স্ত্রী জাতিকে ধন্যবাদ দিলেন কেন?" বেদব্যাস কহিলেন 'সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিকালে শ্রদ্ধার সহিত একবার হরিনাম করিলে সে ফল পাওয়া যায়। আবার শূদ্র জাতি দ্বিজ সেবা দ্বারা এবং নারী জাতি কেবল পতিসেবা দ্বারা মুক্তিলাভ করে, এই জন্য আমি

কলিযুগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়াছি এবং শূদ্র ও নারী জাতিকে ধন্যবাদ দিয়েছি।" ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া কলিযুগকে ধন্যবাদ দিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। এ যুগসার কলিকালে যোগ, ধ্যান, ধারণা, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা কিছুরই প্রয়োজন নাই। এ সকল, শাস্ত্রোক্ত কথা। তাই ভক্তি শাস্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া আমরাও বলি, প্রস্তুত হইতে চাও যদি জীব, তবে শ্রদ্ধার সহিত কর হরি সংকীর্ত্তন—বদন ভরিয়া বল "হরিবোল," প্রাণ খুলিয়া বল "হরিবোল," নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া বল "হরিবোল"। শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে বল "হরিবোল"। কলিযুগে—

"হরিনাম হরিনাম নাম কর সার।
নাম বিনে কলিযুগে গতি নাহি আর॥"

বল তাই, ভাই, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" নদীয়ার চাঁদ ঘরে ঘরে এই নাম বিলাইয়া গিয়াছেন। কি বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কি বর্ণাধম চণ্ডাল, সকলেই এ নামের অধিকারী, যদি প্রস্তুত হইতে চাও, যদি—"এভব সংসার [illegible] মহাপারাবারের পরপারে যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে বল "হরের্নামৈব কেবলম্।" সংসারের কার্য্য করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে অন্তরের সার ধন "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিতে থাক। সংসারের কার্য্য সাধনে রত হও—কিন্তু পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া মুখে না বলিলেও অন্তরে জপিয়া যাও—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নামের মাহাত্ম্য তুমি আমি কি বুঝব? যাঁহারা সাধক, যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক—যাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত সন্তান, তাঁহারা নামের অসীম মহাত্ম্যের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীনামের এই অনন্ত মহিমা—অমৃতময় উৎস বিবিধ গ্রন্থে পরিকীর্ত্তিত প্রবাহিত। যাঁহারা নামের মহিমা ব্যঞ্জক, শ্রুত কর্ণ রসায়ন প্রাণস্পর্শী সুমধুর শ্লোক, কবিতাদির রসাস্বাদনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে ও পবিত্র হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা ভক্তের হৃদয়ভূষণ ভক্তি শাস্ত্রের রত্নমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ধন্য হউন। নাম সিদ্ধ, ভজনাদর্শ মহাপুরুষ

গুণের চরিত কথাও আলোচনা করিয়া নাম মহাত্ম্যের আভাস গ্রহণ করুন। বিশাল বারিধি গর্ভ হইতে কয়েকটী কণিকা সংগ্রহের ন্যায় মহিমোদ্দীপক অনায়াস লব্ধ কয়েকটী মাত্র শ্লোক—কবিতার বিষয় আলোচনা করিতেছি।

স্বয়ং মহাপ্রভু, জীব শিক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, নামের মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বই, নাহি গতি শুন সনাতন॥"

শ্রীবিষ্ণু যামলে উক্ত হইয়াছে—

"মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

শ্রীনারদ গীতায় দেখিতে পাই—

"ভবাব্ধি তরণার্থংহি হরিনাম তরিঃ কলৌ।"

শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন—

"তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥"

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত কলির জীবের আর কোন শ্রেয়ঃ ও কৃত্য নাই, তাই কাত্যায়ন সংহিতা বলিতেছেন—

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম্॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ সমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥
নামৈব পরমা মুক্তি নামৈব পরমাগতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতি র্নামৈব পরমাস্মৃতিঃ॥"

*   *   *   *

নাম ও নামী একই বস্তু। তাই, শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"নাম শ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নাত্মা নাম নামিনোঃ ॥"

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥"

প্রহ্লাদ স্বয়ং বলিতেছেন—

ধ্যানেন লভতে মুক্তিং ত্রেতায়াং যজ্ঞ কর্মভিঃ।
সেবয়া দ্বাপরে চৈব কীর্ত্তনেন কলৌ যুগে ॥"

লঘু ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"কিং তাত বেদাগম শাস্ত্র বিস্তরৈ স্তীর্থৈরণেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণম্ গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥"

অর্থাৎ বেদাগমাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে, কাশী আদি তীর্থ পর্য্যটনে, কোন-প্রয়োজন নাই—যদি মুক্তি ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে পবিত্র হৃদয়ে মনপ্রাণে ঐক্য করিয়া গোবিন্দ গোবিন্দ বলিতে থাক। কেবল তাহাই নহে, নামের মহাত্ম্য আরও শুনিবেন কি?

"গোকোটী দানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগ গঙ্গাম্বুনি— কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণ দানং
গোবিন্দ নাম্না ন সমং শতাংশৈঃ ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ কালে কোটী গাভী দান, প্রয়াগতীর্থে কল্পকাল অবস্থান, অযুতবর্ষব্যাপী যজ্ঞ কার্য্য—সাধন, অথবা গিরিতুল্য স্বর্ণদান, কিছুই গোবিন্দ নামের সমান হইতে পারে না।

নামের মহিমা, বৈষ্ণব কবি প্রেমানন্দ, প্রেমানন্দে মাতিয়া বলিতেছেন—

"ওরে মন বলি হরিবল ভাই।
বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখনা নামের সমান নাই ॥

সাগর লঙ্ঘিয়া ফিরে হনুমান, লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর আপনি তরিল পাথরে বাঁধিয়া রাম॥

দ্বারকা ভুবনে নারদ গোঁসাই সাধিল আপন কাজ।
হরি হরি নাম তুলি দেখাইল, এ তিন লোকের মাঝ॥

আবার—

"মরণ কালেতে কোন খানে কেবা গঙ্গায় পরশি রাখে।
তরণ কারণ নাম বিনা আর কে কার শ্রবণে ডাকে॥"

পাষণ্ডগণের দলন জন্যে আবার পাষণ্ড-দলন গ্রন্থ কি বলিতেছেন, শুনুন—

"নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম বাণী।
নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি॥

নামের মাহাত্ম্য এত নাহি যার পার।
তদক্ষর মাহাত্ম্য শুনি লাগে চমৎকার॥

বনমধ্যে দস্যু ছিল পুরাণেতে শুনি।
মরা মরা জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥

নামের অক্ষর তার এই ফল ধরে।
নামের মাহাত্ম্য বল কে কহিতে পারে?"

নামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার জন্য ভক্তি শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া আমরা আর প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহিনা। ভাই কলিযুগে জীব উদ্ধার করিতে একমাত্র নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। নাম সাধন কর প্রেম আসিবে।—নাম করিতে করিতেই প্রাণ পবিত্র হইতে থাকিবে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপ, ত্যাগ, ধ্যান, জ্ঞান, যাগ, এই সকলের শ্রেষ্ঠ এই মধুর "হরিনাম"; কলির জীবের জন্য এমন সহজ উপায়-লভ্য বস্তু জগতে আর কি আছে? অহো! আমরা কি মহামোহে উন্মত্ত, ভ্রমেও একবার চিন্তামণির ভব-ভয়-চিন্তাহারী নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না—মুখে কি অন্তরে কোণে কি বনে ভ্রমেও একবার বলিলাম না—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।"

প্রস্তুত হইবার এমন সম্বল থাকিতেও তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ধিক্ আমাদিগকে!

দুঃখ-সম্পত্তি।

—:০:—

(প্রসাদী সুর।)

আমি কি দুঃখে রে ডরাই ?
সংসারী চায় কেবলি সুখ, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥
(ওরে) বিষ ছানিয়ে, সুধাপিয়ে, সুখের মুখে দিয়েছি ছাই।
দুঃখ পেয়ে, চিনেছি ভাল দুঃখীর কেবল গৌর নিতাই ॥
সুখের কথা বলব কি আর, মরি ল'য়ে গুণের বালাই।
সুখের রসে, যে জন ভাসে, অহঙ্কারের তার সীমা নাই ॥
সে জন মোহে মত্ত, ভুলে সত্য, মিথ্যাবাদে রত সদাই।
রিপুর বশে, চলে হেসে, শেষেতে অসামাল রে ও ভাই ॥
দুঃখে প'ড়ে এ সংসারে, ব্রজভাবের যে মধু পাই।
তার আস্বাদনে, ভাগ্য গুণে শমনের ভয় ভাবনা এড়াই ॥
(হ'য়ে) দুঃখে মগন, যে পরম ধন রাঙ্গা পা দুখানি বানাই।
তার বিনিময়ে, রাজা হ'য়ে, বিলাস বৈভব কিছুই না চাই ॥

মুক্তি-সংগীত।

—:০:—

আমার বাসনা ঘুচিবে কবে ?
ওমা শবাসনা, এ মন বাসনা, হৃদয়ের বাস কবে উঠাবে ?
বাসনাতে আমার প্রাণান্ত যে হ'ল,
জ্বলিছে সদাই দারুণ অনল,
কবে মহা কাল, বুঝিয়া সুকাল,
বাসনার মুখে অনল দিবে ?

বিষয়-বাসনা বাড়ে দিন দিন,
দিনে দিনে চিত্ত হ'তেছে মলিন,
পাপেতে মজিয়ে তাপে হই ক্ষীণ,
এ ঘোর বাসনা তবু না ছাড়িবে !

মত্ত থাকি সদা কামিনী-কাঞ্চনে,
ভুলিয়া গিয়াছি নিত্য-সত্য-ধনে,
প্রতিদিন হায়, হয় আয়ুঃক্ষয়,
মত্ততা আমায় বুঝিতে না দিবে !

এ কিরে তাহার কুহকের লীলা,
বুঝিতে না পারি এযে ছেলে খেলা,
নাহি জেনে ডুবি, অকূল পাথারে,
রয় প্রাণ মন অসদ্‌ভাবে।

না হইলে হায় গুরু কৃপা-বল,
কোথা পাই বল পারের সম্বল,
হারিয়েছি সব, হইয়াছি শব ;
সুধা-ধারা গুরু কবে বা সিঞ্চিবে ?

যুগল-মাধুরী।

—:০:—

যুগল মাধুরী ! চুপ ! প্রকাশের নয় :
যুগল মাধুরী কর প্রাণে অনুভব,
ধীরে ধীরে করি' পান হওরে তন্ময়,
সুধার সাগরে ডুবি' হওরে নীরব।
ভুল না, ভুল না, ভাই, যুগলের সনে ;
কি আছে ন্নরতে বল, হবে তার তুল ;

তুলনা ও নাহি বুঝি অমর ভবনে ;
মাধুরীর তুলনা সে মাধুরী বিপুল ।
যুগল-মাধুরী নিত্য মাধুর্য্যের খনি,
প্রকৃতির বাহ্য রূপ তাহার কণিকা,
(ঠিক্ যেন চন্দ্র করে ক্ষীণ খদ্যোতিকা)
অপ্রাকৃতানন্দ ভরা, শান্তি প্রদায়িনী ।
জিজ্ঞাসিলে কেহ মোরে, কেমন মাধুরী ।
বলিতে ভাষা না পেয়ে, বলি, হরি হরি ॥

সম্পূর্ণ ।